বাল্য-সুহৃৎ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পণ্ডিচারী)

প্রেমাস্পদেষু •

৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬

ক্ষুধা

এককালে খুবই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহা বহুবার বেতারে অভিনীত হয়; গুজরাটি ও হিন্দীতে অনূদিত হইয়াছে এবং একজন ইংরাজ লেখক ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশের অনুমতি লইয়া রাখিয়াছেন। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া এক্ষণে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল। প্রথমে "ভারতবর্ষ" পত্রে 'ক্ষুধা' দেখা দিয়াছিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার
বাঙলা-বাস
বালিগঞ্জ : কলিকাতা

ক্ষুধা

সেদিন সকালে ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। হরিবল্লভ গুহ একটি বন্ধুকে সী-অফ্ করিতে আসিযাছিলেন, লাহোর-কলিকাতা ডাকগাড়ীটা সেই সময়ে আসিয়া পড়িল। প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে যে সুদর্শন যুবাপুরুষটি নামিলেন, হরিবল্লভ তাঁহার পাইপসংলগ্ন মুখের পানে মিনিট-খানেক অভদ্রভাবে চাহিয়া থাকিযাই হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিযা উঠিলেন, পরিতোষ না?

মাষ্টার মশাই? বলিয়া যুবক পাইপটি সরাইয়া যেন অতি কষ্টে খানিকটা নত হইবার চেষ্টা করিতেই হরিবল্লভ বলিয়া উঠিলেন, থাক্ বাবা থাক্, হযেছে।—

আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন কিন্তু, বলিযা পরিতোষ হাসিল।

বযস ত' বাড়ছে, বাবা! তা এখানে? বেড়াতে নাকি? পরিতোষ হাসিয়া বলিল, চাকুরী কুকুরীবৃত্তি, বেড়ায় দেশে দেশে।—এ আপনারই কথা।—তা আপনারও তাই বোধ হয।—

হঁ্যা। কোথায় থাকবে ঠিক করেছ বাবা?

কিছুই ঠিক করিনি, টেলিগ্রাফে বদলী হয়ে আসতে হযেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে—

তাতে আর কি হযেছে! চলো, আমার বাড়ীতেই চলো বাবা। পরে বাসা টাসা ঠিক হলে—

মন্দ কি, চলুন।

ইত্যবসরে পরিতোষের বয়, বেহারা প্রভৃতি তাঁহার বিছানা ও স্যুটকেশ, টুপির বাক্স এবং গল্‌ফের সরঞ্জাম ইত্যাদি লইয়া সেখানে আসিযা দাঁড়াইল। দেখিযা হরিবল্লভ বলিলেন‥চলো, বাবা চলো।—তোমার বাবা মা ভাইবোনেরা—

বাবা অনেকদিন গত হয়েছেন মাষ্টারমশাই। মা ত' ছেলেবেলাতেই—সে ত' আপনি জানেন। পরিমল কলকাতাতেই আছে, হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। কাবেরী তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত বেড়াতে গেছ্‌ল, যুদ্ধের জন্যে আটক পড়েছে, মাস দুই কোন খবর পাওয়া যায় নি। নর্ম্মদা আর সিন্ধু তাদের স্বামীদের সঙ্গে কলকাতাতেই আছে।

বলিতে বলিতে সকলে প্লাটফর্মের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। হরিবল্লভের টাঙা ছিল, সেটাকে বিদায় দিয়া একখানা মোটর ভাড়া করা হইল। গাড়ীতে বসিয়া পরিতোষ বলিল, আপনি এখানে কতদিন আছেন মাষ্টার মশাই ?

তা—বছর দশেক হবে বৈকি ! হ্যাঁ, তা হবে। তার আগে লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম। তুমি এখন কোথা থেকে আসছ পরিতোষ ?

লাহোর থেকে। আর বলেন কেন, কাল সকাল ৯টায় টেলিগ্রাম পেলুম, বেলা দশটার সময়ই রওনা হতে হলো।—জিনিসপত্তর, গাড়ী ফাড়ী সব সেখানে পড়ে। আগ্রায় ত দেখছি ঠাণ্ডা একটুও পড়েনি। লাহোরে এরই মধ্যে খুব শীত। থামিয়া পরিতোষ একটু কুণ্ঠার সহিত বলিল, এ সবে মাষ্টার মশাই কিছু মনে করছেন না ত ?—বলিয়া সে পাইপটা দেখাইল।

হরিবল্লভ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, না, মনে করবো কেন, মনে করবো কেন ! তুমি খাও না বাবা।

পরিতোষ পাইপটার তামাক টিপিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া টানিতে টানিতে বলিল, অনেক কাল পরে দেখা, প্রায় কুড়ি বছর।

হ্যাঁ তা হবে বৈকি। বি-এ পাশ করার পর আর ত দেখা হয় নি ! তবে শুনেছিলাম, তুমি বিলেত গেছ। কতদিন ছিলে সেখানে ?

পাঁচ বছর। সেই সমযের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন। পরিতোষ একটু পরে প্রশ্ন করিল, প্রফেসারী ছাড়লেন কেন মাষ্টার মশাই ?

লাষ্ট ওয়ারের সময় এটা পেয়ে গেলুম।

আপনার মেয়ে কোথায় ? তার নামটা কি যেন—মাধুরী, না ? তার মা—

মনে আছে !—বলিয়া হরিবল্লভ হাসিলেন। বলিলেন, বারাসতে তার বিয়ে হয়েছে, সেইখানেই আছে, তার স্বামী উকিল। তিনি যেন আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন। পাইপ নিবিয়া গিয়াছিল। পুনরায় ঝাড়িয়া

খোঁচাইয়া, টিপিয়া দেশলাই জ্বালিতে হইল। হরিবল্লভ বলিলেন, কোন্ আফিস বললে তোমার?

ইণ্ডিয়ান আরমি আফিস, বলিয়া সে খুব জোরে জোরে পাইপ টানিতে লাগিল। আগুন নিব-নিব হইয়া আসিয়াছিল। পাইপ এক অধর্ম্ম। বহু চেষ্টায় ধোঁয়া বাহির করিয়া বলিল—হঠাৎ কণ্ট্রোলারের অসুখ হয়ে পড়েছে।—

হরিবল্লভের চক্ষু কপালে উঠিতেছিল; বলিলেন, তুমি কি তবে মালকাহি সাহেবের জায়গায় কণ্ট্রোলার হয়ে এসেছ?

হঁয়া! তাই বটে! আবার পাইপে খুব জোর জোর টান দিতে হইল।

হরিবল্লভ শুষ্ক-কণ্ঠ সরস করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, আমিও যে ঐখানে কাজ করি। অবিশ্যি কেরানি মাত্র!

তাই নাকি! আবার সেই অধর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে হইল। বোধ করি অসাধ্য অধর্ম্ম ভাবিয়া পাইপটাকে পকেটে ভরিয়া পরিতোষ সিগ্রেটের কৌটা বাহির করিল।

হরিবল্লভ ড্রাইভারকে পথটা বাৎলাইয়া দিলেন, তারপর পরিতোষকে বলিলেন, তা হ'লে আমার বাড়ীতে ওঠাটা কি—কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

পরিতোষ সিগরেট ধরাইয়া মুহূর্ত্তখানেক ভাবিয়া লইয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল, তাতে আর কি হয়েছে?

গাড়ী ফটকে ঢুকিল। বেশ বাড়ীখানি, বাগানটি আরও বেশ। সাজানো, গুছানো, পরিপাটি। হরিবল্লভ মাহিনাটা ভাল পান এবং খরচ করিতেও জানেন, অতিথি তাহা একদণ্ডেই বুঝিলেন। চা ইত্যাদির দ্বারা অতিথি-সেবার প্রথম পর্ব্ব উদযাপিত হইলে হরিবল্লভ মুখটা কাঁচু মাচু করিয়া বলিলেন, তুমি বসে বিশ্রাম করো, কাগজ টাগজ দেখ, বাবা, আমি স্নান করি গে।

হঁ্যা যান, বলিয়া পরিতোষ পাইপ-সংস্কারে মন দিল।

হরিবল্লভ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, তুমি ক'টায় বেরুবে?

দেখি, দেড়টা দু'টো।

তা হ'লে নিজে দেখে শুনে—

হঁ্যা, হঁ্যা; সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না। গুরুপত্নী আছেন ত! সে

সব ঠিক হয়ে যাবে।—গুরুপত্নী সেকালে তাহাকে খুব ভালবাসিতেন, আদর যত্ন করিতেন, পরিতোষ তাহা ভুলে নাই। তিনি যে এখনো কেন অন্তরালে রহিলেন, পরিতোষ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল।

হরিবল্লভ সঙ্কোচটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, মাধুরীর মা মারা গেছেন।

পরিতোষ নিঃশব্দে ব্যথিত চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিবল্লভ স্বরটা খুব খাটো ও কুন্ঠিত করিয়া বলিলেন, বছর দুই পরে লক্ষ্ণৌ থাকতে আবার বিয়ে করেছি।

ও আচ্ছা, সে হবে'খন, আমি ঠিক ভাব করে নেবো।

হরিবল্লভ আর কিছু না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। আহারাদি শেষ করিয়া আফিসে বাহির হইবার সময়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়া মুখস্থ করার মত বলিলেন, তা হ'লে পরিতোষ, বাবা নিজের বাড়ী মনে করে—

আচ্ছা, আচ্ছা, বলিয়া পরিতোষ তাঁহাকে থামাইয়া দিল। হরিবল্লভের মুখটা বেশ প্রসন্ন নয় বলিযাই মনে হয়। কি জানি কারণটা কি! বোধ হয় ছাত্র মনিব হইয়া মাথার উপরে বসিয়াছে ইহা মনে করিয়াই মেজাজ অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল; অথবা বৃদ্ধ বয়সে দার পরিগ্রহের বার্ত্তাটা ছাত্রকে নিজের মুখে শুনাইতে হওয়ায়, ঠিক করিয়া কিছুই বলা যায় না।

—দুই—

বহুদিনের পরিচিত নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে যে ভাবে লোকে কথা কহে, বেলা ঘরে ঢুকিয়া সেইভাবেই বলিল, বারটা বাজে, স্নান করবেন না?

পরিতোষ সলজ্জ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, এই যে করি। নমস্কার।

বেলা পূর্ব্বে নমস্কার করে নাই, ইচ্ছা করিয়াই করে নাই, সম্পর্কটা ঠিক নমস্কার করার মতো নয়। এখন অতীব সুন্দর ভঙ্গিমায় নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আজ এবেলা কিন্তু দেশী ভাত ডালই খেতে হবে, সব জোগাড় জাগাড় ক'রে উঠতে পারি নি।

আমি বিলিতি খাবার খাই, মাষ্টার মশাই বুঝি এই কথা বলে গেছেন আপনাকে ?

বললেই বা, দোষটা কি ! ওবেলা সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাষ্টার মশাই জানেন না, ছেলেবেলা থেকে ডাল ভাত লুচি তরকারিতেও আমার অরুচি নেই।

না থাকাই ত' উচিত।

বেলা একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরিতোষ হাসিয়া বলিল, বসবেন না ?

না, বলিয়া বেল' হাসিল ; আবার বলিল, বারটা বাজল, স্নান করে খেয়ে নিন্, সারা রাত গাড়ীতে—

সে সব গা-সহা আছে।

বেলা বলিল, বউ-টউ কোথায় ?

পরিতোষ হাসিয়া মাথা নীচু করিল, নিবন্ত পাইপটাকে নাড়িতে নাড়িতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া সহাস্যে বলিল, বউই নেই, তা টউ।

কেন, বলিয়া ফেলিয়াই বেলা থমকিয়া গেল। বিয়োগবার্ত্তা হইতেও ত পারে। মনে হইল, প্রশ্ন করাটা ঠিক হয় নাই।

পরিতোষ হাসিতে হাসিতে বলিল, সময় পেলাম কই বিয়ে করবার !

বেলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, অনেক সময়ের দরকার নাকি ? কিন্তু, ক'টার সময় খাওয়া অভ্যেস ?

একটা দেড়টা নাগাদ লাঞ্চ খাই।

বেলা ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, তার ত আর দেরি নেই, আমি রান্না ঘরে উদ্যোগ করি গে, স্নান করে নিন্। আর দেরি করা নয়—বলিয়া বেলা চলিয়া গেল। পরিতোষ একটা মহাতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ইংরেজী গানের একটা কলি গাহিতে গাহিতে বাথরুমে প্রবেশ করিল।

খাইতে বসিয়া পরিতোষ বলিল, মনে হচ্ছে সবই নিজের হাতের রান্না।

বেলা চুপ করিয়া একটু হাসিল।

এত কাণ্ড কেন করলেন ?

বেলা আবার হাসিল। একথাটিও বলিল না যে, কাণ্ড কিছুই নয়।

একটা লোকের জন্যে এতো সব করবার দরকার ছিল না। মিছে এত কষ্ট করা—

বেলা বলিল, একটি কেন, দশটি লোকের জন্যে করতেও কষ্ট হয় না, তাও কি বলতে হবে!

পরিতোষ মনে মনে বলিল, না, না, আর বলিতে হইবে না, কিছু দরকার নাই। এ যে বাঙ্গালীর সংসার, বাঙ্গালীর মেয়ে। এই একটি মেয়ের লজ্জারুণ মুখের পানে চাহিয়া সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ও সমস্ত বাঙ্গালী মেয়ের মুখের প্রতিচ্ছবিটা সেই ঘরের মধ্যে প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

পরিতোষ যখন বাথরুমের বাহিরে আসিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুখ মুছিতেছিল, বেলা বলিল, পাণ খাও?

কথাটা বলিয়া ফেলিযাই হাসিল। হাসিয়া আবার বলিল, বয়সে বোধ করি কিছু বড়ই হবে, তবু আপনি বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকছে।

তুমিই ত ভাল।

ভালো হলেও ভালো, না হলেও ভালো, আমি 'আপনি' 'মশাই' বলতে পারিনে আর। পুনরায় সেই হাসি। সদ্যঃফোটা গোলাপের হাসির মত এই হাসিটা যেন ফুটিয়াই থাকে। বলিল, পান খাও ত?

খাই।

বেলা বলিল, তবে সেজে আনি, মিলিটারী সাহেব, কি জানি খাবে কিনা তাই সাজি নি। তুমি বসো।

বিলাতে অনেকদিন ছিল, তাহাদের বংশটাও বিলাত-ফেরতের, নিজেও পুরাদস্তুর সাহেব—কিন্তু পরস্ত্রী যত সুন্দরী এবং মধুর স্বভাবই হোক্, মনে মনেও সে সব আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি, আগ্রহ অথবা অবসর পরিতোষের ছিল না।

বেলা নিতান্ত অসুন্দর নয়; বরং যেমনটি হইলে চোখে ভাল লাগে, সে তাহাই এবং ব্যবহারও অকুণ্ঠ ও মধুর, যত্নও যেমনটি করিয়াছে, কে বলিবে কয়েক ঘণ্টা আগেও কেহ কাহাকেও চিনিত না, নামটাও শোনে নাই। যেন নিতান্তই আপন, একান্তই আত্মীয়, বহুদিবসের বন্ধু, যেন খুবই অন্তরঙ্গতা। কিন্তু দুইটার সময় ধড়াচূড়া আঁটিয়া ভাড়া করা মোটরে বসিয়া পরিতোষ যখন আফিসে

বাহির হইল, তখন তাহার মনে এই কথাগুলা সত্য সত্যই ছিল না। হয় ত লেখকের এই কথাগুলা গিলিতে পাঠককে অনেকখানি চিবাইতে হইবে, আম্‌তা আম্‌তাও করিতে হইবে, কোঁৎ পাড়িতে হইতেও পারে, কিন্তু আমার কথা যে নিছক কষ্ট কল্পনা নয়, পরে সপ্রমাণ হইবে বলিয়া আমি এখন কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিলাম না। পাঠক চিন্তার লাগাম আলগা করিয়া দিয়া ঘোড়া ছুটাইতে থাকুন, লেখক বাধা দিতে নারাজ !

চার্জ লওয়ার ব্যাপারটা কিছুই নয়, অন্ততঃ বড় সাহেবদের পক্ষে। কেরানি ও আজ্ঞানুবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গের সন্ত্রস্ত ও সচকিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া বুটের প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে কামরায় ঢুকিয়া চেয়ারে বসিলেই কাজটা সম্পন্ন হইয়া যায়।

তাহাই হইল। আফিসের লোক সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহাদের ধারণা, বিলাতী সাহেবগুলা পাজি ও বদমায়েস হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালী সাহেবরা ঐ সকল গুণে তাহাদেরও পিতামহস্থানীয়। এই বাঙ্গালী সাহেবটি পূর্ব্বে যে সকল ষ্টেশনে ছিলেন, সেখানকার ইতিহাস কাহারও জানা না থাকিলেও কল্পনাপ্রবণ কেরানিকুল একটা কঠোর ইতিহাস রচনা করিয়াই ভয়ে ভয়ে মনে মনে বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইয়া কাগজে কলমে মন ও মাথা গুঁজিয়া রহিল।

সাহেব যে হরিবল্লভের এককালের ছাত্র এবং আজ তাঁহারই গৃহে অতিথি, এ খবর কেহ জানিল না, হরিবল্লভও একথা জানাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিলেন না। সে বয়স তিনি অনেকদিন পার করিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার অনেক পরে সাহেব ফিরিলেন। হরিবল্লভ রাশি রাশি সংবাদপত্রের মধ্যে মগ্ন ছিলেন, ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি যেন বলিতেও গেলেন, সাহেব ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সোজা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। এ ঘরটা সকালে দেখেন নাই, অথচ খুব জোর আলো দেখিয়া ভিতরে চাহিতেই দেখিলেন, বেলা ডাইনিং টেবিল সাজাইতেছে। একটিবার পরিতোষকে দেখিয়া হাসিয়া নিঃশব্দে কাজে মন দিল।

টেবিল নূতন, টেবিল ক্লথ নূতন, কাঁটা চামচ ছুরি নূতন, ফুলদানি নূতন, ন্যাপকিন নূতন। পরিতোষ দেখিতেছে আর হাসিতেছে। তবে দুজনের মত ব্যবস্থা দেখিয়া সে খুসী হইল।

বেলা মুখ তুলিয়া তাহাকে হাসিতে দেখিয়া বলিল, অত হাসি হচ্ছে যে, উল্টে পাল্টে ফেলেছি নাকি !

উল্টে ফেলেন নি। ফেললেও দোষ হত না। কিন্তু কেন এ অধর্ম?

বেলা হাসিল না, কিন্তু রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, অধর্ম! তার মানে?

মানে! একদিনের জন্যে এতো হাঙ্গামা করার কোন মানে হয় না!

কষ্ট দেওয়ারও কোন মানে হয় না, এক দিনের জন্যেই হোক্ আর দশ দিনের জন্যেই হোক্। আর এক দিনই বা কেন? আমি যে শুনলুম, মালকাহি সাহেবের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি চলেছে, বাঙলো এখন পাওয়া যাবে না।

না, তা পাওয়া যাবে না।

তবে সে ক'দিন এইখানেই থাকতে হবে ত!

পরিতোষ হাসিয়া বলিল, না, কাল সকালেই ডাক্-বাঙলোয় যাবো, ঠিক করেছি। ডাক্-বাঙলোটা দেখেও এলুম।

বেলা মনে ব্যথা পাইল, মুখে তাহা অপ্রকাশ রহিল না। কিন্তু পরিতোষ সেদিকে খেয়ালও করিল না, বলিল, সার্কিট হাউস্‌টা পেলেই হোত ভাল, কিন্তু লাটসাহেব আসবেন ব'লে সেটা ভেঙ্গে চুরে নতুন ক'রে সারাচ্ছে, পাওয়া গেল না। ডাক-বাঙলোটা অবিশ্যি ভাল নয়, কিন্তু—

বেলা কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভালো নয়, কিন্তু থাকতে হবে। কথাটা ত এই! এবার তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যথা গোপন ছিল না।

কিন্তু মনস্তত্ত্বে উদাসীন ব্যক্তি সে পথও মাড়াইল না; বলিল, সেটা কেমন যেন দেখায়, না? সকালেই ত মাষ্টার মশাই ঢোঁক গিলছিলেন!

কেন? বেলা আকাশ পাতাল পরিভ্রমণ করিয়াও ঢোঁক গেলার হেতু নিরাকরণ করিতে পারিল না। তাহার স্বামী কৃপণ নহেন, সংসারও অসচ্ছল নয়, যথেষ্ট সচ্ছল, তবু তিনি ঢোঁক গিলিয়াছেন, বেলা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

পরিতোষ বলিল, আমি অবিশ্যি ওঁর কথাটা গ্রাহ্যই করি নি, কিন্তু উনি মনে করেন, অফিসারের উচিত নয় সাবঅর্ডিনেটের বাড়ীতে থাকা।

বেলা একটু একটু করিয়া কথাগুলা বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়া বলিল, এই কথা! আফিস আর বাড়ী যে এক জিনিস নয়, এটা কি তোমার মাষ্টার মশাই জানেন না! কোথায় তোমার মাষ্টার-মশাইটি—দেখি একবার!

দেখিবার জন্য কোথাও যাইতে হইল না। মাষ্টার মশাই আসিয়া হাফ

প্যান্টের পকেটে কি যেন হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে বলিলেন, লোকে—লোকে কি বলবে, বুঝলে না—

বেলার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, অতি কষ্টে উষ্মা দমন করিতে করিতে খানিক জোরের সঙ্গেই বলিল, লোকেদেরও ডেকে এনে খাইয়ে দিও না একদিন, নতুন ডিনার সেট্—

হরিবল্লভ ঘরের সাজ-সজ্জা দেখেন নাই। এখন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। 'লোকে' 'কি বলবে,' 'বুঝলে না' এগুলা তাঁহার মনে খুব স্পষ্ট ছিল না, তাঁহাদের দিশী ঘরকন্নায় বিলাত ফেরত সাহেবদের নানা অসুবিধার কথাটাই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতেছিল। এখন একেবারে বাঙ্গলাদেশের দক্ষিণ দিকের মলয় হাওয়া আসিয়া মনটাকে জুড়াইয়া দিল। পতিব্রতা, সুশীলা স্ত্রী বলিয়া বেলাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, (লোকে বলে, দ্বিতীয়পক্ষ মাত্রেই এক জাতীয় জীব!) বেলা যে তাঁহার মনের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় ইহা জানিয়া সেই ভালবাসাটাই আরও যে কতগুণ বাড়িয়া গেল তাহা মাপিয়া লইবার জন্য তিনি আর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন না বটে, একটা কথায় সব সাফ্ করিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, বাড়ীর কর্ত্তৃত্বটা আমার হাতে নয়, বুঝলে হে পরিতোষ! ও বিষয়ে কথা আমার না বলাই ভাল।

বেলা হাসিয়া পরিতোষকে বলিল, এখন?

পরিতোষ তেমনিই হাসিয়া বলিল, আপনিই বলুন?

যতদিন না তোমার নিজের কোয়ার্টার পাও, এখানেই থাকবে। জজ্ যেমন ফাঁসির রায় উচ্চারণ করিয়াই এজলাস্ ছাড়িয়া চলিয়া যান, বেলাও সেইমত চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, ডিনার য়্যাট্ এইট্ ত? ঠিক আছে। তবে হিঁদু কেরানির বাড়ী, গং টং নেই, ঠিক আটটায় এসে বসো।

বেলার বাবা পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল ছিলেন। কোনও আদব-কায়দা তাহার অজানা নাই, পরিতোষ এ খবর না জানিলেও মনে মনে অকপটে স্বীকার করিল যে, বাঙ্গালীর মেয়ের একটিমাত্র রূপ দেখিয়াই যাঁহারা দেশ-বিদেশের পানে চাহিয়া চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইতে ধাবিত হন্, তাঁহারা হয় মূর্খ, না হয় অন্ধ। কিম্বা একসঙ্গে দুইই। সকল দেশের সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের, মনোহারিত্বের সারাংশটুকু চয়ণ করিয়াই বিধাতা বঙ্গনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। আজই প্রথম একটা অজানা

ও অভাবিতপূর্ব্ব অভাব ভিতরকার অনেকখানি স্থান জুড়িয়া স্বপ্নময় আবেশ জাগাইয়া তুলিল।

—তিন—

প্রথমে মনোহরলাল মিশ্র দেখিয়াছিল, পরে তাহাদের আফিসের আর একজন কেরানিও দেখিল, মিসেস্ হরিবল্লভ তাহাদের নূতন বড়সাহেবের মোটরে চড়িয়া তাজ, দুর্গ, জুম্মা মসজেদ, ফতেপুর দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। যদিচ শীতের জ্যোৎস্না তেমন স্পষ্ট নয়, আনন্দদায়কও নয়, বর্ষার জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট, তবুও জ্যোৎস্না। পরিতোষ বলিল, আজ তাজ দেখতেই হবে। ঠিক দিনে আমার গাড়ীও এসে গেছে, চলুন, যাই। বেলা সানন্দে স্বীকার করিল। হরিবল্লভ খবরের কাগজগুলা ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার একটু যেন সর্দ্দিভাব হয়েছে, ইত্যাদি। পরিতোষ বলিল, তবে আর আপনার কাজ নেই গিয়ে। হরিবল্লভ ঘরের মধ্যেই ব্যালাক্লাভাটা ভাল করিয়া টানিয়া টুনিয়া, নিশ্চিন্তমনে খবরের কাগজ অধ্যয়নে রত হইলেন। তাজমহলের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে বেলা বলিল, তাজে এলে আমার সাজাহান বাদশার কথাই মনে পড়ে। কি ভালই বাসত বেচারা তার স্ত্রীটিকে! মরার পর ভালবাসা যেন আরও বেড়েছিল। তাই মনে হয় না?

হয়—পরিতোষ এই কথা বলিয়া একটু চুপ করিল; তারপর বলিল, কিন্তু আরও একটা কথা মনে হয়।

বেলা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পরিতোষ বলিল, সেকালের রাজারাজড়ার যত কীর্ত্তি দেখি, আমার মনে হয়, প্রজাহিত চেষ্টাটাই তাঁদের খুব বেশী পরিমাণে ছিল।

কথাটা বেলা ঠিক বুঝিল না, পরিতোষ তাহা বুঝিয়া পুনরায় বলিল, এই যে কীর্ত্তিগুলি, এর মূলে দেশের শিল্পী, কারিগর, স্থপতি, মজুরদের আহার দেওয়ার চেষ্টাটাই ছিল বড়। যখনই দেশে অন্নাভাব হয়েছে, প্রজার অর্থ কষ্ট হয়েছে, রাজারাজড়ারা এমনই সব কাজ স্থরু করে দিতেন। প্রজাও খেতে পেতো, তাঁদের কীর্ত্তিও গড়ে উঠতো। বাঙ্গালা দেশের পাড়াগাঁয়েও শুনেছি,

জমিদাররা বড় বড় পুকুর, বাঁধ, মন্দির করতেন ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই। অবশ্য তাই হওয়া উচিত। নইলে রাজা কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় ক'রে হাত গুটোলে প্রজারঞ্জন বা প্রজাপালন হয় না। সেকালের রাজারা সেটা ভালই জানতেন।

বেলা হাসিয়া বলিল, একালে?

পরিতোষ হাসিয়া কহিল, বর্ত্তমানের আলোচনা করতে নেই; শাস্ত্রে নিষেধ আছে। সে কাজ পরবর্ত্তীকালের লোকের জন্যে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

বেলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, বুদ্ধিমান ছেলে, বুদ্ধির কথাই বলেছে! সরকারের নিমক খেতে হয়, নিমক-হারামি করাটা অন্যায়, তাই না?

পরিতোষ হাসিল।

মনোহরলাল এই দিনই দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল—কথাবার্ত্তা শুনে নাই, কেন না, অনেক দূরে থাকিতে হইয়াছিল, কাছে আসিবার সাহস হয় নাই—দেখিয়াছিল যে, ইহাদের গল্প শেষ আর হয় না। কথাটা সে পার্শ্ববর্ত্তী কেরানি কৈলাসনাথ চৌবেকে বলিয়াছিল, চৌবে চুপি চুপি হরিশচন্দ্র ভাটকে বলে; হরিশ ভাট বলে, সে নিজেই মিসেস্ হরিবল্লভকে সাহেবের সঙ্গে ফতেপুর সিক্রিতে দেখিয়াছে। কথাটা এই পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল, আর অধিক দূর যায় নাই। যাইতও না যদি না আফিসে ইত্যবসরে একটা কাণ্ড ঘটিত।

জয়মাধব সিংহ যমুনার ওপারের একটা গ্রাম হইতে আসিত। সে পেন্সনবিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিল; হঠাৎ একদিন খবর আসিল, প্লেগে জয়মাধবের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ঠিক নিম্নস্থ কর্ম্মচারী মনোহরলাল প্রোমোশন পাইবে ইহাই সকলে জানিত। ছোট সাহেব তাহার পক্ষে মস্ত নোট্ লিখিলেন। মনোহরলালের সার্ভিস সীটে অনেক দাগ আছে, দু-একবার তাহাকে দণ্ড দিতেও হইয়াছে, এই সব লিখিয়া শেষকালে কিন্তু সুপারিশ করিলেন, তা হোক্, লোকটা বুড়া হইয়াছে, বছর খানেক মাত্র চাকরীর বাকী, উহাকেই পদটা দেওয়া হোক্। ছোট সাহেব খাঁটি ইংরেজ, মেজ সাহেবও তাই, মেজ সাহেব ঢেঁরা সহি আঁটিয়া ফাইল বড় সাহেবের কাছে পাঠাইলেন। বড় সাহেব একটা ছোট সহি দিলেই পারিতেন এবং মিটিয়াও যাইত, কিন্তু সেটুকুও দিলেন না। ছোট সাহেবকে সেলাম দিলেন। ছোট সাহেব বারকতক কতকগুলা ফাইল বগলে সেলাম বাজাইলেন; পরে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিবল্লভকে ডাকিয়া হাসিমুখে

ফাইলটি অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, আই কনগ্র্যাচুলেট্ ইউ হড়িবালব ! বড় সাহেবের যুক্তিও অকাট্য, নির্দ্দেশও ন্যায়সঙ্গত। যে লোকের সার্ভিস সীট্ নানা কলঙ্কে কলুষিত এবং নিতান্ত দয়াপরবশ গভর্ণমেণ্ট যাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই, তাহাকে পুরস্কৃত করার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বিভাগের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হরিবল্লভই পরবর্ত্তী যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহাকেই পদোন্নতি দেওয়া সঙ্গত।

বলা নিতান্তই বাহুল্য যে, উহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। হাইকোর্টের উপরে মামলা চলে না। হরিবল্লভ 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন, আফিসের চেহারা কালো হইয়া উঠিয়াছে। খুব ফর্সা লোকগুলির মুখেও কে যেন আলকাৎরা মাথাইয় দিয়াছে। দেওয়াল, চেয়ার টেবিল, ফ্যান, আর্দালীর মুখ সব অন্ধকার ! একদল বলিল, যেহেতু হরিবল্লভ বাঙ্গালী এবং বড় সাহেবও তাহাই, অতএব ইহা আমাদের জানাই ছিল। কিন্তু কথাটা কি ঠিক ? বাঙ্গালী আর যাহার জন্যই কাঁদুক, বাঙ্গালীর জন্য কাঁদে না ; অনুভবও করে না। ইংরেজ ইংরেজের জন্য ভাবে ; মাড়োয়ারী মাড়োয়ারীর দুঃখ বোঝে ; মুসলমান মুসলমানের দরদ জানে ; পাঞ্জাবীর কাছে পাঞ্জাবীর আদর ; কিন্তু বাঙ্গালী বাঙ্গালী-ভোলা। বাঙ্গালী বুঝে, আমি ও আমার।

মনোহরলালের দল বলিল, আসল কারণ তাহাদের জানা আছে। তিন্-চারজন অর্থপূর্ণ হাস্য করিল। কাষ্ঠহাসি বটে, কিন্তু অর্থ সুগভীর।

হরিবল্লভ পদোন্নতিটার আশাও করেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়ায় খুসী হন্ নাই ইহাও যেমন বলা যায় না, মনোহরলালের কথা ভাবিয়া একটুও দুঃখিত হন্ নাই এ কথাও তেমনি বলা যায় না। বড় সাহেব অবিচার বা অন্যায় করিয়াছেন এ কথা বলা খুবই অন্যায়, তবুও কেমন-যেন মনটা প্রসন্ন হইতেছে না। হঠাৎ মনে হইল, বড় সাহেব তাহার বাড়ীতে না থাকিয়া—

বেলা বলিল, ঐ মনোহরলাল ছাড়া তোমার ওপরে আর কেউ ছিল ?

না।

তবে তুমি কেন এতো—

না, তা না, তবে—

ঐ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। রাত্রে খাইতে বসিয়া বেলা সহাস্যে কহিল, আজ শুনলুম, গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়েছে!

পরিতোষ বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল।

বেলার মনে হইল, পরিতোষ বুঝিয়াছে সব, কিন্তু যেন বুঝে নাই এই ভান করিতেছে। বলিল, গুরুদেবকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে, মাইনে বেড়েছে।

ওঃ তাই! গুরু বলে পান্ নি, জয়মাধবের পরে উনিই যোগ্য ব্যক্তি, তাই পেয়েছেন। পরিতোষ আর কিছুই বলিল না।

যাহারা আফিসে কর্ম্ম করে না, তাহারা বুঝিবে না যে, ইহা কতবড় বিপর্য্যয় কাণ্ড। কয়েকদিন ধরিয়া আবহাওয়াটা এমনই গুমোট হইয়া রহিল যে, এরূপস্থলে যাহা একান্ত স্বাভাবিক, সেই খাওয়াইবার কথাটাও কেহ তুলিল না। অন্য অন্য সময়ে কি ধরপাকড়ই না হয়! আরও একটা কাণ্ড ঘটিল। হরিবল্লভের স্থান কে পায় ইহা লইয়া যখন চাপা আন্দোলন চলিতেছিল, অকস্মাৎ বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি নিক্ষিপ্ত হইল। জানা গেল যে সদ্য এম্ এ পাশ করা এক আন্‌কোরা মুসলমানকে ডেপুটী করা হইয়াছে। এটা যদিও ছোট সাহেবই করিয়াছেন, মেজ সাহেব ঢেঁরা সহি এবং বড় সাহেব ধোবী মার্ক সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন মাত্র, দোষটা যে বড় সাহেবেরই, তাহাতেও কাহারও সন্দেহ রহিল না।

গভর্ণমেণ্ট আফিস, মিলিটারী বিভাগ, আফিসের ভিতরে জটলা করিবার, দল পাকাইবার, ঘোঁট করিবার সুযোগের অভাব বটে, আফিসের বাহিরে বাধা দিবার কেহ থাকে না। এইরূপ একটি সম্মিলনে যে কয়টি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইল, তাহা যেমন কুরুচিব্যঞ্জক, তেমনই জঘন্য। বড় সাহেবের চাপরাসীকে খৈনি খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করিয়া হরিশচন্দ্র ভাট-বাবু জানিয়াছিলেন যে, বড় সাহেব আগ্রা আসাবধি হরিবল্লভের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। মনোহরলাল প্রভৃতি যাহা দেখিয়াছেন হরিশচন্দ্রের সংবাদ তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিবামাত্র সমস্তই একেবারে সুনির্ম্মল হইয়া গেল। হরিবল্লভ প্রাচীন, তাহার দ্বিতীয় পক্ষ তরুণী এবং বড় সাহেব অকৃতদার, এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ যে প্রলয় করিতেও পারে সে বিষয়ে সকলে একমত।

বাহিরের কথা বাহিরে থাকিলেই ভাল হইত কিন্তু থাকিল না। ভিতরেও আসিল, হরিবল্লভও শুনিলেন। তাঁহারই একজন অনুগত কর্মচারী সংবাদটা তাঁহাকে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল। কথাটা বাঙ্গলাদেশের পল্লীগ্রামে উঠিলে বিস্ময়েরও হেতু ছিল না, দুঃখও হইত না। বাঙ্গলা দেশ হইতে বহুদূরে, স্ত্রী-স্বাধীনতা যেখানে অব্যাহত, স্ত্রী-শিক্ষা যেখানে সুদূর বিস্তারিত, সেখানে এই নোংরা কথা শুনিবার আশঙ্কা না করিবারই কথা। বেলা সেই কথাই বলিল, তোমাদের আফিসের লোকগুলার উচিত হুগলী জেলার হাতিকান্দায় গিযে বাস করা। হরিবল্লভেরও সেই মত।

নিজের বয়সের কথাটা বেলার মনে ছিল না। স্বামী প্রাচীন এবং সে নবীন, ইহাও সে ভুলিয়াছিল। মনে করাইযা দিবার লোকও ছিল না, কারণও ঘটে নাই। বহু আত্মীয-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত এ বাড়ীতে আসিযাছে, থাকিযাছে, চলিযা গিয়াছে, তাহারাও মাথা ঘামায় নাই। কেনই বা ঘামাইবে?

বেলা পরিতোষকে বলিল, শুনেছ তোমাব আফিসের বাবুদের কথা!

ঐটুকু শুনিয়াই পরিতোষ বলিল, কুৎসা রটাচ্ছে নাকি?

বেলা কথা বলিবার আগেই পবিতোষ হাসিযা বলিল, আপনাকেও জড়িয়েছে বোধ হয়?

বেলা বলিল, তোমার মাষ্টার মশাই বুড়ো, তায দ্বিতীয় পক্ষ—

পরিতোষ রোষ্টটা কাটিতে কাটিতে বলিল, সেই পুরানো কথা! অত্যন্ত হ্যাক্‌নিড। ওতে আর নতুনত্ব নেই!

বেলা হাসিযা বলিল, কতকগুলো কথা আছে, যা যত পুবোনোই হোক্, চিরনতুন।

তা যা বলেছেন, বলিযা মাংসখণ্ড মুখগহ্বরে প্রেরণ করিল। চিবাইতে চিবাইতে বলিল, গুরুজী গেলেম কোথায? ভয় পান্ নি ত?

ভয় পেয়েছেন কিনা বলতে পারি নে; তবে খোশামোদ করবার জন্যে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছেন—বলিয়া বেলা হাসিল।

কেমন?

মতলব করেছেন ভোজ দিতে হবে—

পরিতোষ সাশ্চর্য্যে কহিল, বটে!

বেলা হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, মনোহরলালের বাড়ী গেছেন, কে কে খাবে, তারই ফর্দ্দ ধরতে।

পরিতোষ ন্যাপকিনে মুখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মত আছে?

ওমা, তা আবার নেই!

ঐ সব শুনেও?

বেলা সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, আমি শুধু বলেছি, ও বড়দিন পর্য্যন্ত দেরী করা চলবে না বাপু! মালকাহি ত বাঙলো' ছেড়ে দিয়েছে, বড়সাহেব কখন হুট্ বলতে চলে যাবেন, তার ঠিক নেই, তিনি এই বাড়ীতে থাকতে থাকতে আমি তাদের সকলকে খাওয়াতে চাই।—বলিয়া বেলা পুডিঙের ডিস্‌টা পরিতোষের সামনে আগাইয়া দিল।

বেশ বলেছেন, বলিয়া পরিতোষ আহারে মন দিল।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া ওঠে নাই, নিষ্পত্তিটাও সুস্পষ্ট হয় নাই, তাই পরদিনই আবার কথা উঠিল। মালকাহি-পরিত্যক্ত বাঙলো সাফ্-সুত্‌রা হইয়াছে, সাজান গোছানোও হইয়াছে, এখন সাহেবকে উঠিয়া যাইতেই হয়। পরিতোষই কথা তুলিয়াছিল। শুনিয়া তাহার গুরুপত্নী আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, সে কি, কালই ত' বললুম, বাবুদের খাওয়ান দাওয়ান হয়ে যাক্, তখন একদিন—

পরিতোষ বলিল, তার ত সাত-আট দিন দেরি এখনও।

বেলা বলিল, হলোই বা দেরি! জলে পড়ে নেই ত তুমি!

না, না, তার জন্যে নয়, বিস্তর জিনিসপত্তর এসে পড়েছে কি-না—

আগলাবার লোক নেই তোমার? না থাকে, দুটো দরোয়ান এই ক'দিনের জন্যে রেখে দিলেই পারো।

পরিতোষ হাসিয়া মাষ্টার মশাইকে বলিল, শুনছেন—

মাষ্টার মশাই অম্লানমুখে বলিয়া দিলেন, ঐ রোগ!

বেলা হাসিয়া, রাগিয়া, ঝঙ্কার দিয়া, বলিয়া উঠিল, রোগটা কি তাই শুনি? কেউ এলে ছাড়ি নে, এই ত!

মাষ্টার মশাই পরিতোষের উদ্দেশে সহাস্যে বলিলেন, দেশ থেকেই হোক্ আর যেখান থেকেই হোক্, চেনা হোক্ আর অচেনা হোক্, কেউ দু'দিনের জন্যেও যদি এলো, আজ দিন ভাল নয়, কাল সংক্রান্তি, পরশু মাসপয়লা, ডাইনে যোগী,

বাঁয়ে যোগিনী, তার পরের দিন তেরস্পর্শ, অশ্লেষা, মঘা, কালবেলা, বারবেলা, তারা অশুদ্ধ, যাত্রা নাস্তি—

বেলা বলিল, হ্যাঁ, করিই ত। তার হয়েছে কি ? না-হয় জুতো-মোজাই পরি, ইংরাজি নভেল পড়ি, তাই বলে হিন্দু নই, পাঁজী-পুঁথি সব মিথ্যে নাকি ? ও সব না মানলে কি হয় জানো ? ওঃ ভারি আমার মাষ্টার মশাইগো !

মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন, এই সেদিন হলো কি, লক্ষ্ণৌ থেকে আমার এক বন্ধুর খুড়শ্বশুরের ছেলে বৌ এলো, তারা দেশ দেখতে বেরিয়েছে, তাদের একটি মাত্র ছোট ছেলে—উনি জেদ ধরলেন, ছেলেটিকে এখানে রেখে যেতে হবে। কচি ছেলে, তাকে ছেড়ে মা-ই বা থাকে কেমন করে ; আর ছেলেই বা থাকতে পারবে কেন, উনি কিন্তু একেবারে গোঁ ধরে বসলেন—

গোঁ ধরবে না ত কি করবে ! আমার মত একলা থাকতে হোত ত বুঝতে, বাড়ীতে না একটা জনমনিষ্যি, না একটা ছেলে, না একটা—বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং চক্ষুর নিমিষে চায়ের বাটি ফাটি ফেলিয়া সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, অনেকক্ষণ আর তাহাকে দেখা গেল না।

—চার—

ধর্ম্ম অনেক রকমের, সেটা সকলেই জানেন। নারীধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, সেবা-ধর্ম্ম, ব্রতধর্ম্ম, তীর্থধর্ম্ম, এ সকল ত আছেই, উপরন্তু নারীর জন্য আর একটা ধর্ম্মের কথা তাহার বুকের ভিতরের অনুশাসনগ্রন্থে লিখিত অথবা অলিখিত আছে জানি না, কিন্তু তাহার প্রভাবও বড় অল্প নয়। সেটা যাহারই জন্য হোক্ না কেন, খানিকটা ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের ধর্ম্ম। এ না করিতে পারিলে নারীর জীবনটা যেন ফাঁকা থাকিয়া যায়। দরকারী অদরকারী যত উপকরণ দিয়া ভরাইবার চেষ্টা হোক্ না কেন, ফাঁকটা ফাঁকই থাকে, বুজে না। বেলা যে মুহূর্ত্তে বুঝিল আর কাহারও জন্য কোন কাজ করিবার নাই, কাহাকেও তুষ্ট করিবার জন্য এতটুকু পরিশ্রম করিবার নাই, যত্ন, একাগ্রতা ব্যয় করিতে হইবে না, অলস মধ্যাহ্নটা একেবারে বিস্বাদ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার স্বামীর প্রয়োজন অতীব অল্প, নাই বলিলেই

হয়। শুধু প্রয়োজনই অল্প নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত সেবা যত্ন লইতে তাঁহার আগ্রহ এত কম, যে সে সব দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার আশা আরও কম। তাই সে যখন আগের মত, বিছানায় শুইয়া, আফিস ঘরের চেয়ারে বসিয়া, রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়াইয়া কোনও মতে আপনাকে কোন কাজেই লাগাইতে পারিল না, তখন বিগত কয়দিনের কর্ম্মব্যস্ততা মনে করিয়া তাহার চক্ষুপল্লব কেবলই ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। কোন অতিরিক্ত কাজের ভার কেহই তাহাকে দেয় নাই, বস্তুত কাজ যতটুকু, সেটুকু করিবার লোকের অভাবও সংসারে ছিল না, তবু সে সবটাই তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার নিজের হাতে টানিয়া লইয়া কয়েকটা দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটি কাজ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিয়াছে ভাবিতে আরও বেশী করিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িতেছে। অতিথি অভ্যাগতের জন্য ততখানি করিবার দরকারও ছিল না, না করিলে, কি অতিথির, কি হোতার দোষ ধরিবারও কিছু ছিল না, তবু তাহার অন্তরের ভিতরকার কর্ম্মপরায়ণ পরিশ্রমী নারীধর্ম্মটা অনেকদিন পরে যেন তাহাকে ঠেলা দিয়া কাজের সমুদ্রের মাঝখানে নামাইয়া দিয়াছিল। কুমারী বয়সে যখন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন, সেই বালিকা বয়সেও, এই নারীটির পরিচয় সর্ব্বদাই মিলিত; তাহার পর নারী যেন কোথায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল, এ তল্লাটেই ছিল না। হঠাৎ যেদিন স্বামীর এককালের এই ছাত্রটি আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিল, সেই দিন সেই সঙ্গে সেই প্রবাসী-নারীটিও সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিতোষ সুশ্রী, মিষ্টভাষী, সৌখীন ও সুরুচিসম্পন্ন যুবক, তদুপরি সে ধনবান এবং সাহেবী ভাবাপন্ন, তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার ও পরিতোষের তুলনায় সঙ্গতি স্বল্প, বেলার পক্ষে অতিথিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা যত দুরাশাই হোক, নারী তদ্দণ্ডেই নারীত্ব পুঞ্জীভূত করিয়া উঠিয়া বসিল; পরাজয়ের চিন্তাটাকেও মনের মধ্যে উঁকি মারিতে দিল না। আজ যখন সে চলিয়া গিয়াছে, তখন পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া সুগভীর সন্তোষের সহিত গর্ব্ব অনুভব করিতেও পারিতেছে যে, তাহার সর্ব্ব চেষ্টা জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু এই জয়ের চিন্তাটাই যে এত বড় দুঃখের, এত করুণ, আর অবিশ্রান্ত চোখের জলের এত বড় একটা উৎস, সে কথা কে জানিত—শুধু চোখের জলের সহিত সংগ্রাম করিয়াই দিবাবসান হইল এবং সন্ধ্যার সময় স্বামী ফিরিলে কফি প্রস্তুত করিতে করিতে স্বামীর মুখ হইতে কোন একটা বিশেষ খবর শুনিবার

জন্য উন্মুখ আগ্রহে চাহিয়া রহিল কেন, তাহার কোন হদিস সে নিজেও পাইল না। হরিবল্লভ অভ্যাসমত রাশীকৃত খবরের কাগজের সংবাদ-শিরোনামাগুলি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন এবং পড়া শেষ করিয়া পোশাক বদলাইবার জন্য যখন কক্ষান্তরে গমনোদ্যোগ করিলেন, তখন হঠাৎ যেন প্রশ্নটা মনে পড়িয়া গেল এবং আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহে না, এমনভাবে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সাহেবের সঙ্গে দেখা হোলো ? বলিয়া মুখখানা যতটা সম্ভব হাসি হাসি করিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

হরিবল্লভ বলিলেন, না ; আজ আর দেখা হয় নি।

তিনি এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই খবরটা শুনিবামাত্র কেন যে বেলা কাঁদিয়া ফেলিল, সে নিজেও তাহা বুঝিল না, কিন্তু তাহারই লজ্জায় জড়সড় হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছাদে পলাইয়া গেল।

পরিতোষ তাহার বাঙলোয় চলিয়া গিয়াছে। তা যাক, কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, তাহার পর কতদিন কাটিয়া গেল, একদিন একটিবারের জন্যও এ পথ মাড়াইবার কথা তাহার মনেও হইল না। বেলা প্রতিদিনই মনে করিত রাত্রে ডিনারের পর বেড়াইতে বাহির হইলে নিশ্চয়ই একবার আসিবে কিন্তু প্রতিদিনই তাহার অনুমান মিথ্যা হইয়া যাইত। আফিসে মাষ্টার মহাশয়কে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইয়া খবর লওয়ায় আদপ-কায়দায় যত বাধাই থাক্, কোন-না-কোন ছলেও কি তাহা করা যায় না ? সমস্যা যখন কোন মতেই ভঞ্জন হইল না, তখন একদিন সে হরিবল্লভকে বলিল, আজ বলে এসো, রাত্রে এখানে খাবে।

বাপ্‌রে ! আফিসে ! সে কি হয় ?

তবে বাড়ীতে গিয়ে বলে এসো। না, না, কোন কথা আমি শুনতে চাই নে। কতদিন সে খায় নি তা জানো ?

হরিবল্লভ হাসিয়া বলিলেন, খায় নি মানে ? প্রায়োপবেশন করছে, সে খবর ত শুনি নি।

বেলার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে একমাসের ওপর খায় নি, তার খবর রাখ ?

হরিবল্লভ বলিলেন, আজ আর কখন্ যাব ? কাল সকালে গিয়ে ব'লে আসবো, যাতে কাল এখানে খায়।

আচ্ছা, বলিয়া বেলা নিজের কাজে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে ডাইনিং টেবিল সাজাইতেছে দেখিয়া হরিবল্লভের মনে পড়িল, সাহেবের বাঙলোয় না গেলে আর চলে না। কিন্তু বাঙলোয় দেখা করার বা বিড়ম্বনা! স্লিপে নাম পাঠাইয়া আধ ঘণ্টা বসিয়া থাকার পর সেলাম আসিলে হরিবল্লভ দেখা করিলেন। বিলম্বের জন্য সাহেব ঈষৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। হরিবল্লভ নিমন্ত্রণের কথাটা বলিলেন।

সাহেব বলিলেন, আজ! আমি যে জেম্‌সের নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছি।

তবে, কাল?

কাল? দেখি—বলিয়া সাহেব এনগেজমেণ্ট বুক খুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল রায়বাহাদুর গিরিধারলাল এখানে খাবে। গিরিধারলালকে ত জানেন আপনি, এক্সাইজ কমিশনার। সাহেব বহি বন্ধ করিলেন।

ডাইনিং টেবিলের সজ্জার কথা মনে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল, হরিবল্লভ বলিলেন, পর্শু হয় না?

সাহেব নোট্‌ বুক টানিলেন, কিন্তু না খুলিয়া, কক্ষবিলম্বিত দিনপঞ্জীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, পর্শু, এগারোই ত! টুরে যাচ্ছি, ষোলই ফিরবো— বলিয়া থামিলেন। একটু পরে বলিলেন, ফিরে এসে আমি খবর দেবো। কেমন?

হরিবল্লভ অগত্যা বলিলেন, তাই হবে।

বেলা আগুন হইয়া উঠিল, বলিল, তা আমি জানি-নে। আমার সব যোগাড়-যাগাড় হয়ে গেছে, আর উনি বলছেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাস্তবিক যোগাড়-যাগাড় কিছুই হয় নাই। যোগাড় করিতে কতটুকু সময়ই বা লাগে! আসল কথা, তাহার মন যে সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আদর যত্নে খাওয়াইতে টেবিলের একান্তে বসিয়া গিয়াছিল, সে ছাড়া এ কথা কে বুঝিবে!

দিচ্ছি সব টান মেরে ফেলে, বলিয়া বেলা ত্রস্তপদে অন্যত্র চলিয়া গেল। হরিবল্লভ তাহার চোখের কোণে জল দেখিয়াছিলেন। তাঁহারও মনের ভিতরে এতটা বাড়াবাড়ি না হোক্, মনটাও ভাল ছিল না। "না" করা ছাড়া সাহেবের অন্য উপায় ছিল না কথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের এমন কঠোর ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রত্যাখ্যানও হরিবল্লভ ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আফিসে বাহির হইতেছেন, বেলা বলিল, তোমার একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিও ত একবার।

দোব, বলিয়া হরিবল্লভ টাঙায় উঠিলেন।

গল্পের এতখানি পড়িয়াও যাঁহারা হরিবল্লভকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্যই একথাটা বলা দরকার হইয়া পড়িতেছে যে, ফাইল, পে-সীট, মাষ্টার রোল্ প্রভৃতির ভিতরে নিমিষে মগ্ন হইয়া হরিবল্লভ চাপরাসী পাঠাইবার কথাটা ভুলিতে বিলম্ব করিলেন না এবং দিনান্তে ফাইলের বোঝা নামাইয়া যখন গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া দুটি অগ্নিগোলক সদৃশ দৃষ্টির সম্মুখীন হইবামাত্র বিস্মৃত কথাটা স্মৃত হইল, তখন জিভ কাটিয়া "ঐ যা" বলিয়া মাথাটা চুলকাইতেও তাঁহার বাধিল না। প্রত্যুত্তরে ওপক্ষ কোন জবাব দিল না বটে, কিন্তু চোখের জল আর কিছুতেই গোপন রহিল না। কিন্তু পরের দিন হরিবল্লভ যাহা করিলেন, তাহা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। আফিসে আসিতেই তাঁহার চাপরাসী নিবেদন করিল, বড়সাহেব দুইবার সেলাম পাঠাইয়াছেন, ছোটসাহেবও একবার। হরিবল্লভ প্রথমটা ঘড়ির দিকে চাহিলেন, যথাসময়ে আসিয়াছেন বুঝিয়া মনটা কতকটা হাল্কা হইল। কতক হাল্কা হইল কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। একে ত বড়সাহেব কাহাকে কখনও ডাকেন না—মেজসাহেব ও ছোটসাহেবের নিচে না নামিতেই তাঁহারা অভ্যস্ত— তায় দু'দুবার ডাকিয়াছেন, হরিবল্লভ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বড়সাহেবের কামরার সম্মুখীন হইয়া শুনিলেন, মেজসাহেব আছেন। অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। মেজসাহেব বাহির হইলে তিনি ঢুকিলেন। বড়সাহেব খুব ব্যস্ত। বাঁ হাতে একখানা চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া প্যাডের উপর রাখিয়া বলিলেন, এইটি বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। গিরিধারদের ডিনারটা পিছিয়েই দিলাম। বড়সাহেব যেমন লিখিতেছিলেন, লিখিতে লাগিলেন।

হরিবল্লভ গুড্ মর্ণিং স্যার বলিয়া বাহির হইতেই ছোটসাহেবের চাপরাসী ধৃত করিল। দু' মাসের হিসাবে দুইটা মস্ত ভুল ধরা পড়িয়াছে, হিসাব-বিভাগ কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ চাহিয়াছে শুনিয়া হরিবল্লভের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ছোট সাহেব তাহা বুঝিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, হরিবোলব, ভুলটা তোমার সময়ের নয়, পুওর জয়মাধবের সময়ের। তোমার ভয় নাই।

হরিবল্লভ কড়া মন্তব্যটা পাঠ করিলেন, সেটা খুবই কড়া বটে!

ছোটসাহেব বলিলেন, হিসাবটা আগাগোড়া পরীক্ষা করাও। ও নোটের জবাব আমি তৈয়ার করিতেছি। হরিবল্লভ স্বস্থানে আসিয়া কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া পরীক্ষার ভার দিলেন এবং পাছে ঠিকমত পরীক্ষা না হয়, তাহাদিগকে তাঁহার টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া তখনই কাজ স্বরু করাইয়া দিলেন। এককালে ছাত্রেরা মাষ্টার মহাশয়দের ঘিরিয়া বসিয়া যেমনভাবে পড়া বুঝাইয়া লইত, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কেরানিকুল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে দু-এক্কে দুই, দুই দুগুণে চার করিয়া আফিস জমাইয়া ফেলিল। কিন্তু সেই চিঠিখানা পকেটেই রহিয়া গেল। ভুলটার উৎপত্তি ধরা পড়িল না, মনটা খারাপ থাকিয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া কফি খাইলেন, চাপরাসী কতকগুলা খাতা রাখিয়া গিয়াছিল, খুলিয়া হিসাবের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। আটটা বাজিয়াছে কি বাজে নাই, মোটরের খুব জোর হর্ণের শব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিতেই দেখিলেন, বড়সাহেব। খাতাগুলা সরাইয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে যাহা শুনিলেন তাহার সম্পূর্ণার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তবে এইটুকু বুঝা গেল যে এখানে শীঘ্র আহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইবে। বড় সাহেব একেবারে ভিতরের দিকে প্রস্থান করিলেন। হরিবল্লভ মাথা চুলকাইলেন, এদিক ওদিক চাহিলেন, বাড়ীর ভিতরের দিকে এক পা অগ্রসর হইলেন, পুনশ্চ থামিলেন এবং অন্ধকারে কিয়ৎকাল হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘরেই বসিলেন।

মোটরের হর্ণ বেলাও শুনিয়াছিল এবং বারান্দায় জুতার জোর শব্দ শুনিয়া শয়নকক্ষ হইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঁকি মারিয়াই অবাক্ হইয়া গেল। পরিতোষ বলিল, রেডি ?

বেলা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরিতোষ বলিল, দেরি আছে বুঝি ? তা'হলে আমি এখন যাই, ফিরে এসে খাবো, কেমন ? দশটা স'দশটা হবে, একটু দেরীও হ'তে পারে—কষ্ট হবে, না ?

বেলা যেন আর সামলাইতে পারিতেছিল না, বলিল, তুমি কি এখানে—

পরিতোষ বলিল, কেন, আমার চিঠি পান্ নি ?

চিঠি, কই না ! কখন পাঠিয়েছ ?

জিজ্ঞাসা করুন, কখন !—বলিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইল। আবার হাসি-

মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড আমি জানি! তা আসব, না, আসব না?

বেলা দাঁত দিয়া সজোরে অধর দংশন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, যত রাত হোক্, এসে খাবে। আমি ব'সে থাকবো।

আচ্ছা, বলিয়া পরিতোষ তেমনি শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

বেলা কয়েক মিনিট সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আজ সমস্ত দিন তাহার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে, বুকের ভিতর কেবলই হু হু করিয়াছে; সেবাপরায়ণা নারী ও স্নেহাতুরা মাতা, রহস্যপরায়ণা সাথী, এই সকলের সংঘর্ষে আজ সারাদিন সে কি কষ্টই না পাইয়াছে। সকালে বাসার বামুন ঠাকুরকে দিয়া লিখিয়া পাঠায় যে আজ রাত্রে পরিতোষকে খাইতেই হইবে, কোন ওজর আপত্তি শুনিবার ইচ্ছা তাহার নাই। বামুন ঠাকুর এমনই বুদ্ধিমান যে সাহেব গোসলখানায় শুনিয়া চিঠি ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। একটু অপেক্ষা কর্, জবাবটা নে, তা নয়! হিন্দুস্থানী খোট্টাগুলার যদি একটুও বুদ্ধিসাধ্যি থাকে! তারপর ভাবিল, পরিতোষের ত চাপরাসী, আর্দালী, দরোযানের অভাব নাই, নিশ্চয়ই খবর পাঠাইয়া দিবে।

বিকাল পর্য্যন্ত কোন খবরই যখন আসিল না, তখন বিশ্বের বিতৃষ্ণা লইয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এখন আর চোখের জল ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে শুধু ঐ বিতৃষ্ণাটাই বাড়িতেছিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, একখানা খাম হাতে করিয়া হরিবল্লভ দাঁড়াইয়া আছেন। বোধ করি এই দিকেই আসিতেছিলেন। মাঝে মাঝে হরিবল্লভের মাথাটা বড়ই চুলকায়, কে জানে খুশ্‌কী অথবা মরামাসে সেটা ভরিয়া উঠিয়াছে কিনা! বেলা ব্যাপারটা সবই বুঝিল, কিছু বলিল না, চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া গেল।

ভুল সংশোধনের কোন চেষ্টা হরিবল্লভ করিলেন না। বোধ করি কি করিয়া কি করিতে হয় তাহাও জানা ছিল না। তাই সেই খাতাগুলায় চোখ ও মন গুঁজিয়া দিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। হিসাবের ভুল বাহির করাই উদ্দেশ্য, কিন্তু দেখিতে লাগিলেন, প্রত্যেক পাতায় গণ্ডায় গণ্ডায় ভুল। কাজেই কিছুক্ষণ পরে ভিতরে যাইতে হইল।

বেলা রান্নাঘরে, দু'টো উনুন, দু'টা ষ্টোভ, একটা ইলেকট্রিক হিটার জ্বালিয়া—তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, তোমার খাবার ত সময় হয়েছে, ঠাকুর দিয়ে দিক। কি বল ?

হরিবল্লভ মহা-পরিত্রাণ পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, হ্যাঁ, তা দিক। আমার আবার রাত হ'লে, হ্যাঁ জান ত!

খুব জানি। তুমি বস গে, ঠাকুর যাচ্ছে। আমি কিন্তু যেতে পারবো না, মন দিয়ে, চেয়ে টেয়ে নিয়ে খেও, বুঝলে, ভুলটুল ক'রে বসো না যেন, বলিয়া বিলোল কটাক্ষে হরিবল্লভের খুশ্‌কী ভরা মাথাটাকে ঘুরাইয়া দিয়া ডেকচি প্যান খটাখট করিতে লাগিল।

পাঁচ

লাটসাহেবের আসিবার কথা ছিল, হঠাৎ সংবাদ বাহির হইল, টুর ক্যান্সেলড্‌। এই দিকটায় প্লেগ দেখা দিয়াছিল। প্লেগ আগে যমুনার ওপারে ছিল, যমুনায় জল কম, গরু ছাগলও হাঁটিয়া যায়, প্লেগও কখন্ টুক্ করিয়া নদী পার হইয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক হইতেই খবর আসিতেছে টপাটপ্ ইন্দুর মরিতেছে, আর লোকও টুপ্ টুপ্ করিয়া জ্বরে পড়িতেছে, গালগলা ফাঁপিয়া উঠিতেছে, ইন্দুরদের প্রদর্শিত পথে তাহারও সরিয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় লাটসাহেবকে আনা যায় না। তাঁহার জীবনের দাম অনেক বেশী। তিন-চার কোটি লোকের জীবনের দাম এক করিলেও তাহার কাছেও পৌঁছে না। শহরে অনেকগুলি তোরণ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেগুলার লতাপাতাগুলা শুকাইতে লাগিল; সার্কিট হাউসের সুমুখে যে প্যাণ্ডাল হইয়াছিল, তাঁহার বাঁশগুলা ডাক্তারখানার মড়ার হাড়ের মত খাড়া রহিল; মধ্যস্থলে তক্তাপোষ জড়ো করিয়া যে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ব্যর্থ প্রণয়িনীর শয্যার মত সেইখানে পড়িয়া পড়িয়া যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, আঞ্জুমান ইত্যাদি এবং প্রভৃতিদের মানপত্র

ছাপার বিলের টাকার জন্য ছাপাখানার মালিকরা দেহের মাংসে কামড় ধরাইবার উপক্রম করিল। তাহাদের বোধ হয় এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে লাটসাহেব যেমন উহাদিগকে হতাশ করিয়াছেন, উহারা তাহাদিগকে সেইরূপ নিরাশ করিবার চেষ্টায় আছে। তাই সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা তাগাদা পাঠাইতেছিল।

বড় শহরে যদি সংবাদপত্র না থাকে তবে সব খবর সব সময়ে যে পাওয়া যায় না, গেলেও সঠিক সংবাদ না হইয়া অতিরঞ্জিত সংবাদই পাওয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। নিত্য খবর পাওয়া যাইতেছে, অমুক গঞ্জে আজ ত্রিশটা, অমুক মহল্লায় আজ কুড়িটা মরিয়াছে—আর শ'খানেক শুঁষিতেছে। সংবাদ সত্য বা মিথ্যা যাচাই করিয়া প্যানিক হয় না। বরং যাচাই করা হইলে প্যানিকই থাকে না। কিন্তু এ রকম সময়ে যাচাই করার কথাটা কাহারও মনেই আসে না। শহর হইতে লোক যে দলে দলে পলায়ন করিতেছে, যে যে পথে পারে, পলাইতেছে তাহা সর্ব্বদাই চোখে দেখা যাইতেছে। ট্রেণগুলা যেন আর সামাল্ দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাসগুলার ত মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

জয়মাধব কিছুদিন আগে গিয়াছিলেন, হরিবল্লভদের আফিসের ডেস্‌প্যাচার কান্তিলাল শনিবার আফিস করিয়া গিয়া সোমবারে আর আসিলেন না। খবর পাওয়া গেল, আর আসিবেন না, অন্য কোন জগতের আফিসে চাকরি মিলিয়াছে। বুধবার হইতে হরিবল্লভ কামাই—এ্যাবসেণ্ট উইদাউট নোটিশ।

সরকারী আফিসে—অন্য আফিসেও বটে—ইহা গুরুতর অপরাধ। মনোহরলাল হাজিরা বহিতে লাল কালীতে গুটি পাঁচ-ছয় মূল্যবান শব্দ লিখিয়া ছোটসাহেবের কামরায় পাঠাইয়া দিলেন। ভরসা ছিল, সাহেব যথাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবেন।

ছোটসাহেবটা কিন্তু গাড়োল, লিখিয়াছে অসুস্থ নয় ত ?

বৃহস্পতিবারেও হরিবল্লভ অনুপস্থিত, শুক্রবারেও তাই।

ছোটসাহেব মুসলমান ডেপুটিকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা কেহ খবর লও না কেন ? শনিবারে চাপরাসী আসিয়া জানাইল, উনকে মেমসাহেবকো 'উহি' হুয়া। এই উহিটা যে কি তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। মনোহর-লালের কথা জানি না, অন্যবাবুরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, আফিসের পর তাঁহারা খবর লইতে যাইবেন। আর যাহাই হোক, হরিবল্লভ চমৎকার লোক।

আর সেদিন তাঁহার স্ত্রী কতরকম রান্নাই না রাঁধিয়াছিলেন! সমস্ত পরিবেশন নিজে করিয়াছিলেন। শুধু কি তাই? প্রত্যেককে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া পীড়াপীড়ি চাপাচাপি করিয়া কি খাওয়ানোটাই খাওয়াইয়া ছিলেন! অনেকরই পরদিন অনাহার বা অর্ধাহার হইয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়েদের ঐ একটা মস্ত দোষ, খাওয়াতে বড্ড জেদাজেদী করে।

আফিসের ছুটির সময় দেখা গেল মনোহরলালও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছেন। মনোহরলালের একজন রাজনৈতিক চেলা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, সবাই যাইতেছে, আপনি না গেলে মানে দাঁড়াইবে যে আপনি হরিবল্লভের হিংসা করেন। আফিসের লোকে এই মন্ত্রীটিকে শকুনি আখ্যা দিয়াছিল— মনোহরলাল তাহার বড় বাধ্য।

হরিবল্লভ চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ভাই, তোমরা কেউ জান কি বড়সাহেব টুর থেকে ফিরেছেন কি-না?

এ ওর, ও এর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখে না। হরিবল্লভ আকুলকণ্ঠে বলিলেন, ভাই একজন যদি একটিবার যাও, উনি একবার দেখতে চাইছেন, কিছু বলবেন বোধ হয়, সময়ও হয়ে এসেছে, বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমি যাচ্ছি।

তোমরা বসো ভাই, বলিয়া হরিবল্লভ ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বাস্তবিক সময় হইয়া আসিয়াছিল। সে সময়কার সে ঘরের দৃশ্য বর্ণনা করিবার বাসনা আমার নাই; থাকিলেও চিত্রিত করিতে পারিতাম না। দুইটি বিদেশী নার্স দুইদিক হইতে দুইটা অক্সিজেনের চোঙ্গা রোগীর দুই পাশ হইতে ধরিয়া আছে—রোগীর পক্ষে তাহাও অসহ্য, হাত দু'টি আস্তে আস্তে নাড়িয়া সেগুলা সরাইতে নির্দ্দেশ দিতেছে। ডাক্তার গম্ভীর মুখে ওদিকে চেয়ারে বসিয়া ঘাড় নাড়িতেছেন। হরিবল্লভ বেলার একখানা হাত ধরিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

বাহিরের ঘরে আফিসের বন্ধুরা বসিয়া আছেন। মনোহরলাল কি একটা কথা বলিয়া প্রাণহীন-শব্দহীন স্তব্ধ সভায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, অত্যন্ত ঘৃণায়, প্রায় সকলেই তাঁহার সান্নিধ্য হইতে সরিয়া বসিয়াছেন।

হরিবল্লভ আর একবার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কেউ গেছে ?

আলম্ সাহেব তখনি গেছেন, শুনিয়া হরিবল্লভ আবার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেলা ঘরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, পরিতোষ আসে নি ?—তাহার দু'টি-চোখ দিয়া দুইটি ধারা নামিয়া আসিল ! হরিবল্লভ কোঁচার খুঁট দিয়া ধারা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, খবর পাঠিয়েছি বেলা।

পাঠিয়েছ, বলিয়া বেলা চক্ষু মুদিল। কিন্তু অশ্রুর ধারা শেষ হয় না। হরিবল্লভ যতই মুছিয়া দেন, আবার গড়ায়।

ডাক্তার বাক্স খুলিয়া ইঞ্জেক্‌সানের ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, বেলা চক্ষু চাহিয়া হরিবল্লভকে কহিল, লক্ষীটি, বারণ করো, আর ওসব না।

হরিবল্লভ কি যেন বলিতে গেলেন, বেলা দু'টি হাত তুলিয়া বলিল, ওসব আর না, শুধু তোমার পায়েরধূলো আমার মাথায় একটু দাও।

হরিবল্লভ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তারদের শাস্ত্রে বোধ করি এই কথা লেখা আছে যে যতক্ষণ শ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ আশা ছাড়িবে না, আর ফুঁড়িতেও কসুর করিবে না।

তিনি অগ্রসর হইয়া আসিতেই বেলা স্বামীর হাতটা টানিয়া লইয়া আকুল কণ্ঠে বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, আর ফুঁড়তে দিও না।

হরিবল্লভ ডাক্তারকে নিষেধ করিলেন। বেলা তাঁহার হাতখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পা দুটি একবার তোল না গো।

হরিবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে পা তুলিলেন। যাহা সকল বাঙালী মেয়ে করে, করিবার প্রবল বাসনা আমরণ পোষণ করে, বেলা তাহাই করিল, তারপর দোরের পানে চাহিয়া বলিল, সে বুঝি আর এলো না !

বাহিরে একসঙ্গে অনেকগুলা জুতার শব্দ শুনা গেল এবং একটা শব্দ এই ঘরের কাছে আসিয়া বাহিরেই থামিয়া গেল। পরিতোষ জুতাটা বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ঘরে ঢুকিল। হরিবল্লভ বেলার মুখের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিলেন, বেলা, বেলা, দেখো, দেখো, একটিবার চাও, পরিতোষ এসেছে।

বেলা চাহিল। চক্ষু মেলিতে বড় কষ্ট তবু মেলিল। মুখখানি প্রসন্ন হইল। ডানহাতটি অধরোষ্ঠের ওপর রাখিয়া অতিকষ্টে বলিল, তুমি দিও।

পরিতোষ আসিয়াই বেলার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছিল, নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বেলার মুখে হাসির মৃদু একটি রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল, বুঝতে পারলে না? নিঃসন্তান মরার বড় দুঃখ। ছেলের যেটা বড় কাজ, তুমি করো। মুখে আমার--

কথাটা শেষ হইল না। পরিতোষ তাহার পায়ের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

তার তিন ঘণ্টা পরে বেলার জীবনাবসান হইল।

ছয়

পরদিন আফিসের লোক সবিস্ময়ে দেখিল, হরিবল্লভের পায়ে জুতা আছে, কিন্তু বড়সাহেবের পা খালি। হরিবল্লভ শান্তভাবে কাজ করিতে লাগিলেন, বড়সাহেব আধঘণ্টা পরেই চলিয়া গেলেন।

মনোহরলাল ইহার টিকাভাষ্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পরম অনুগত বাধ্য শকুনিই ঝঙ্কার দিয়া বলিল, এখন থামুন মশাই, ইতরোমির অনেক সময় পাবেন।

মৌনী বাবা

শ্বেত-পীত-লোহিত-ধূপছায়-বর্ণ, বিচিত্রাকার অলকা-তিলকা-সজ্জিত ললাট, জটাজূট-বিভূষিত মস্তক, ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গ; ধূমারক্তনেত্র, চিমটাকম্বলকমণ্ডলুধারী, কৌপীনোপরিবাঘছালপরিহিত সাধু ও সন্ন্যাসী তোমরা বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ। তাঁহাদের কেহ বিরিঞ্চি বাবা, কেহ ধৃতরাষ্ট্র বাবা, কেহ নারদবাবা, কেহ সাধু বাবা, কেহ বা শুধুই বাবা! কিন্তু সংসারে বাস করে, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর করে, ধুতি কামিজ পরে, মোজা জুতা পায়ে দেয়, আফিসে. চাকরী করে, অথচ মৌনীবাবা, ইহা তোমরা বোধ হয় দেখ নাই। আমিও একাধিক দেখি নাই, একটি মাত্র দেখিয়াছি এবং সেই একটির কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া আজ আমার মসীকলঙ্কিতকালামুখলেখনী ধন্য করিতেছি। শোন তবে মৌনীবাবার গল্প।

১

গণেশ লোকটি দেখিতে রোগা ও পাকসিটে গোছের; কিন্তু তাহার গায়ের জোর অসামান্য, মনের জোর তার চেয়েও বেশী এবং এই দুইটা মিলিত জোরের চেয়েও তাহার নিজের জোর বেশী এবং সেই জন্যই বোধ করি তাহার মনের জোরে ও গায়ের জোরে প্রায়ই যে মল্লযুদ্ধ হইত তাহাতে কেহ কাহাকেও হারাইতে পারিত না। গণেশই জয়লাভ করিত। গণেশ লোকটি ক্ষীণকায়, ক্ষীণজীবী অথচ পরিশ্রম করিতে পারে অসাধারণ। বিপদে লোককে অভয় দিতে এবং লোকের আপদে তুড়কি লাফ খাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাহার জোড়া দেখি নাই। তাহার মেজাজটা সকল সময়ে ভাল থাকে না বটে, কিন্তু যখন ভাল থাকে তাহার মুখের হাসি মিলায় না, গণেশের অধরের হাসি কন্যাকুমারিকা হইতে কর্ণের হিমাচল পর্য্যন্ত

উচ্ছ্বসিত। আমি যে-গ্রামে বিবাহ করিয়াছি, গণেশের বাস সেই গ্রামে, আমার সঙ্গে তাহার পরিচয় আমার বিবাহের রাত্রিতে। বিবাহান্তে তৃষ্ণায় বরের ছাতি ফাটিতেছে, কুটুম্ব স্বজনগণ ডাবের জল খাইবার জন্য বরকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছেন, বরও না বলিতেছে না, অথচ ডাব আসি আসি করিতেছে কিন্তু আসিতেছে না! হঠাৎ দৃষ্ট হইল, ধৃষ্ট ডাব বৃক্ষশির হইতে বরের প্রীত্যর্থে এতক্ষণেও নামিয়া আসে নাই শুনিয়া গণেশ রুষ্ট হইয়া এক লাফে নারিকেল গাছের শীর্ষে পৌঁছিল এবং গোটা চার পাঁচ হেঁচকায় ধৃষ্টতার সাজা দিয়া দিল। যেন তাহাতেও তাহার রাগ পড়িল না, পাট-কাটা দা দিয়া কচা-কচ্ শব্দে কাটিয়া কুটিয়া তবে সে থামিল। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের মনে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল কিনা জানি না, তিনি পঞ্চাশজন বলিয়া দেড়শতজন বরযাত্রী লইয়া গিয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের মুখ ও বুক শুকাইয়া দিয়াছিলেন। এই দেড়শতজনের মধ্যে একশত সাড়েবিয়াল্লিশজন শহুরে লোক, অজীর্ণের আসামী, পঞ্চাশজনের খাদ্য সামগ্রীতেই তাঁহাদের বাইরণের সোডার তল্লাশ করিতে হইতেছিল। আর কিছুতেই শ্বশুর মহাশয় জব্দ হইলেন না, সবই কুলাইয়া গেল, মাছের কালিয়াটায় কেবল টান পড়িল। গণেশ বলিল, কুছ্ পরোয়া নেহি! বলিয়া তাহারই বয়সী একজন যুবককে সঙ্গে লইয়া একটা ছেঁড়া জাল ঘাড়ে ফেলিয়া সামনের পুকুরটায় নামিযা গেল রাত্রি বারোটায়, রাত্রি একটায় ভিয়ান ঘরে কালিয়ার গামলায় মাছের কালিয়া টলমল করিতে লাগিল। গণেশের নামে ধন্য ধন্য পড়িযা গেল। পল্লীগ্রামে তখনও রাজনীতির ঝড়ো হাওয়া প্রবেশ করে নাই তাই, নহিলে ছেলেরা শুণ্ডবিহীন গণপতিকে ইন্দুরের পৃষ্ঠ হইতে নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া জয় গণেশজীকি জয় রবে গ্রাম ফাটাইয়া চৌচির করিত। আমি গণেশের সঙ্গে আলাপ এবং ভাব করিয়া লইলাম।

বিকালে বর-কনে বিদায়ের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। বরপক্ষ দমেও ভারী, দলেও ভারী। পঞ্চাশের স্থানে তিন পঞ্চাশ আসিয়াছে, কাজেই তাহারা দলে ভারী; আর তাহারা ইচ্ছা করিলে সদ্যবিবাহিতা কনেকে অবহেলে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও পারে; ইহাতে বুঝিতে হয় যে তাহারা দমেও ভারী। ব্যক্তিগত বচসা যখন জীবিত-মৃত পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত

পৌঁছিল এবং পিরাণের আস্তিনের সঙ্গে যখন ছাতা ও লাঠির প্রতি মনোযোগ দিবার অবস্থা ঘটিল তখন সেই না-কাল না-ফরসা বেঁটে রোগা পাকাটে লোকটা হঠাৎ মরুভূমিতে অবতীর্ণ হইল মাটী ও শিকড়শুদ্ধ একটা ত্রিশহস্ত পরিমিত বাঁশ আস্ফালন করিতে করিতে। সে কথা বলিল একটি ছত্র, বাঁশটা ঘুরাইল পঞ্চাশ-বার, চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত ও বিঘূর্ণিত হইল একশত পঞ্চাশবার। খাঁটি হিন্দি বলিল, মারকে হাড্ডি চুর চুর করেগা।

হাড্ডি অর্থাৎ হাড়ের উপর মায়া অল্পবিস্তর সকলেরই আছে ; বিশেষ করিয়া যাহারা ত্রিশ পার, তাহাবা জানে, হাড ভাঙ্গিলে জোড়া লাগিবে না, মায়াটা তাহাদের কিছু বেশী। বর পক্ষের লম্ফঝম্ফ কমিয়া আসিতেছিল. তাঁহারা চটপট কোমলে নামিলেন। আমিও গণেশের হাতটা চাপিয়া ধরিলাম, গণেশ বাঁশটা ফেলিয়া দিল, চক্ষুব প্রসারণ সঙ্কোচন বিঘূর্ণন স্তব্ধ করিল। বর-কনে চলিয়া গেল।

গণেশ কাজকর্ম্ম করে না, তাহার বাড়ির লোক তজ্জন্য বড়ই অসন্তুষ্ট। গণেশ বলে, চাকরি করিবার ফুর্সৎ কোথায ?

গ্রামের নিকট ও দূবরর্ত্তী গ্রামসমূহের বেওয়ারিশ শব দাহ না কবিলে দুর্গন্ধে লোক মরিয়া গ্রাম উৎসন্ন যাইবে, কাজেই সে কাজটা সে ছাড়িতে পারে না, গ্রামে ঐ একটি মাত্র যাত্রার দল, জেলাময় তাহার গাওনা, দলের পাণ্ডা হইবার লোক একজন জুটিলেই গণেশ ছুটি পায়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি প্রাণীও দায় ঘাড়ে লইতে আসিল না, এত সাধের যাত্রার দলটিকে সে উঠাইযা দিতে পাবে না ; বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই অবনত হইযা পড়িতেছে, ওলাউঠা, বসন্ত, বেরিবেরি, সম্প্রতি দেখা দিযাছে ঝিন্‌ঝিনিযা—এক এক চোটে গ্রাম উজাড় করিতে চেষ্টা করে, তখন বারোয়ারী কালীপূজা বাবোয়ারী শীতলা ও ওলাবিবির পূজা দিয়া কোনমতে গ্রামগুলিকে যে রক্ষা করা হয—সে সবের চাঁদা সাধে কে ? গণেশ। বাঁশঝাড়ে কোপ দেয় কে ? গণেশ। আটচালা বাঁধে কে ? ঐ গণেশ। বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার সঙ্গে নাচে কে ? ঐ গণেশ। সবাই যে বলে গণেশ শহরে যা, চাকরি-বাকরি কর। বেশ, না হয় গণেশ শহরে গেল, একটা চাকরিও জুটাইল এবং করিতে লাগিল, কিন্তু গ্রামটি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তখন ঠেকাইবে কাহার সহধর্ম্মিনীর কোন্ সহোদর, সে হিসাবটা সেই সঙ্গে

লোকে দেয় না কেন! না বাপু না, সোনার গ্রামখানিকে শ্মশান হইতে দিতে সে পারিবে না।

কিন্তু গণেশ বিয়ে করে না কেন? গ্রামের লোকের এ দুঃখটাও বড় কম নহে। ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী আসা ও থাকার সম্পর্কে গণেশের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিয়াছিল। গ্রামের লোক আমাকে ধরিয়া পড়িল ছোঁড়াটার বিয়েতে মতি করাইয়া দিতে হইবে। কাজটা সহজ নহে। ক্ষুধা নাই এমন জীব চরাচরে নাই। যৌবনকালে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রধানী দিল্লী শহরের নাড়ুতে কাহারও অরুচি থাকে এ বিশ্বাস আমার নাই; বরং রাজধানীর সুস্বাদু পদার্থটির মাত্রাধিক্যেও লোকের অরুচি হয় না, আমার এই বিশ্বাস। গণেশ যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, আমি কি করিব? তবু বলিলাম। সে যে উত্তর দিল তাহা প্রকৃতপক্ষে অভাবনীয় এবং অভিনব। সাধারণতঃ ঐরূপ অনুরোধের এইরূপ জবাবই মিলে যে, বিয়ে ত করিব, খাওয়াইব কি! গণেশ সে দিকও মাড়াইল না, ম্লানমুখে বলিল, জামাই, আমার যোগ্য কনে পাইতেছি না। হাসিলাম, হাসিবার কথা, হাসিব না?

কিন্তু গণেশ গম্ভীরভাবে বলিল, তুমি দাও না জামাই, একটি দেবগণের মেয়ে, এখুনি বিয়ে করি। নরগণও চলবে না, রাক্ষসগণও হবে না, দেবগণ চাই, পার দিতে?

গ্রামের লোককে সে কথা জানাইলাম। তাহারা কনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা নরগণ পাইল, রাক্ষসগণও পাইল, দেবগণ পাইল না; দূর দূরান্তরে খোঁজ চলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য, তল্লাটে দেবগণ কন্যা একটিও নাই। গণেশ বলিল, জামাই, খোঁজ করতে আমি কি কসুর করিছি হে, কনে পাই নে ত করি কি বল! আসল কথা তোমায় খুলে বলি শোন, আমার রাক্ষসগণ, রাক্ষসগণ কনে আমার সঙ্গে খাপ খাবে না, লড়াই হবে; নরগণ কনেও চলবে না, আমি তাকে খেয়ে ফেলব। আর বার বার টোপর পরে বর সাজা ভাল নয়, তুমি কি বল?

কিন্তু এখনকার লোকে এ সব মানে না।

আমি খুব মানি জামাই।

কেউ যখন মানে না, তখন তুমিই বা মানবে কেন?

—সবাইয়ের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তাস পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বারোয়ারীর চালা বেঁধে বাপের ভাত কেউ মারে না, কিন্তু আমি মারি। আরে, সবাই বলে চাকরি কর। কেন রে বাপু? বাপ-ঠাকুর্দ্দা যে এক মাঠ ক্ষেত ভূঁই রেখে গেল, সে তবে কিসের জন্যে? আমার বাপ, তার বাপ, তারও বাপ—কেউ কোন দিন চাকরি করলে না, বসে খেয়ে গেল, আমিই বা কেন চাকরী করব!

—জমি জিরাত বাড়বে বলে!

—বাড়বে না কচু, আমি যাব চাকরি করতে আর পাঁচ শা···য় নেবে সব ভোগাভুগি দিয়ে।

ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যত তর্কই উত্থাপিত করি না কেন, যাহার খাইবার পরিবার সংস্থান আপনা হইতেই হইয়া আছে, তাহাকে বেহাই দিতে আমার অন্ততঃ আপত্তি হইল না।

তা যেন হোল, কিন্তু বিয়েটার কি হয়?

মেয়ে দাও, বিয়ে করি।

ভরসা দিলাম, দিব, তিষ্ঠ! আমার মেয়ে হইলে নিশ্চয়ই দেবগণ হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রীর ধারণা আমি শাপভ্রষ্ট দেবতা; আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার ধারণাটা ঠিক কি —তাহা না হয় নাই বলিলাম, তবে তিনি যে শেফালিকা (তাঁহার নাম) ঘোষ না লিখিয়া শ্রী (মতী নয়) শেফালিকা দেবী লিখিতেছেন, ইহাতে আমার পূর্ণ সমর্থন না থাকিলেও আপত্তি যে করি নাই তাহা সুনিশ্চিত। আমি দেব এবং তিনি দেবী অতএব এতদুভয়ের সুখমিলনে যে সুকন্যা জন্মগ্রহণ করিবে সে নিশ্চয়ই দেবগণযুক্তা হইবে, আর গণেশ যদি ততদিন অপেক্ষা করে, আমি তাহার আক্ষেপ মিটাইয়া দিব। ধীরপ্রকৃতি গণেশ রাজী হইয়া গেল; বুঝিলাম, তাহার তাড়া নাই। সুখবরটা স্ত্রীকে দিলাম এবং বলিলাম, একটি সুকন্যার জননী হওয়া নিতান্ত দরকার, তবে ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই, কারণ, জামাই হাতছাড়া হইবে না। তিনি বলিলেন, গলায় দড়ি। কাহার, তাহা বুঝিলাম না; বুঝিবার চেষ্টা করাও সমীচীন বলিয়া মনে হইল না।

কিছুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর মুখে শুনিলাম, মালঞ্চগ্রামে দেবগণসম্পন্না একটি কনের সন্ধান মিলিয়াছে। দুই একদিনের মধ্যেই গণেশ

কনে দেখিতে যাইবে। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম, ম্লানমুখে বলিলাম, ইস্।

স্ত্রী বলিলেন, ইস্ করলে যে!

বলিলাম, ভাবী জামাইটি হাতছাড়া হয়ে গেল।

স্ত্রী ভদ্রলোক, ভদ্রকন্যা, ভদ্রপত্নী তাঁহার সেই এককথা, গলায় দড়ি।

কাহার গলায় দড়ি—সে সমস্যা পূরণ এবারও হইল না। তবে আশাভঙ্গ-জনিত অপরাধের বোঝাটা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যেই ত অমন জামাইটি হাতছাড়া হল! স্ত্রী রুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমার দোষটা হল কি শুনি?

তোমার দোষ এই যে এখনও মেয়ে হল না!

এবার আর তিনি গলায় দড়ি বলিলেন না, কারণ বোধ হয় নিজের গলায় দিতে হইবে আশঙ্কায়! অধিকতর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেখ বেশী চালাকি কর যদি—

চালাক অপবাদ আমার শত্রুতেও কোনদিন দেয় নাই। হ্যাঁগা স্কুল মাষ্টার কখনও চালাক হয়? তাহারা ফিচেল হইতে পারে, শয়তানও হইতে পারে, ধূর্ত্ত হইতেও আটকায় না, কিন্তু চালাক তাহারা কোনদিনই নয়! কাজেই যে বস্তুর একান্তই অভাব তাহাই অর্থাৎ চালাকি প্রকাশের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ঘটিতে পারে ভাবিয়া আমি বহির্বাটীতে চলিয়া গেলাম।

তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।

দেখি গণেশ। গণেশ বলিল, জামাই, কাল অনেক রাত্তিরে শুনলুম তুমি এসেছ, তখন নিধে গরাইএর বিধবার সৎকার করতে যাচ্ছিলুম, তাই আর আসা হয়নি। তা কেমন আছ?

দুই-চার কথার পর গণেশ বলিল, জামাই হাত দেখতে জান?

হাত দেখিতে জানিতাম না, অনেক বিদ্যার সঙ্গে ও বিদ্যাটাও অনায়ত্তই ছিল, কিন্তু সে কথা বলিলাম না। বলিলে গণেশের অভিসন্ধিটা অজানাই থাকিয়া যাইত; বলিলাম, কিছু কিছু জানি বৈকি!

দেখ ত, বলিয়া গণেশ দক্ষিণ করতল অগ্রসর করিয়া দিল। হাত দেখিতে না জানি, হাত দেখাইতে আমরা খুবই অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের হেড

মাষ্টারের বন্ধু সুরেশ বিশ্বাস মাঝে মাঝে কর্মখালির সন্ধান লইতে স্কুলে আসিত এবং হেডমাষ্টার হইতে ইন্‌ফ্যাণ্ট মাষ্টার—ইনফ্যাণ্ট ক্লাশের মাষ্টার—সকলেই তাহার দিকে মুলা বাড়াইয়া দিতেন। একবার একজন মাষ্টারকে সে বলিয়াছিল, You have got to fly from Dacca—কথাটা ফলিয়া যায়। অবশ্য সে বায়ুরথে উড়িয়া গিয়াছিল কিম্বা অন্য কোন যানের সাহায্য লইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাকে স্কুলের কর্ম ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইয়াছিল, ইহা ঠিক; তদবধি কর-কোষ্ঠী-বিচারক সুরেশের গণনায় সকলেই অবিচলিত আস্থা-সম্পন্ন। স্কুলমাষ্টারী না পাইয়া সুরেশ কিছুদিন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিল, কাগজ উঠিয়া গেলে একটা ইন্সিওরেন্স কোং খুলিয়াছিল, সেটি ৮ত্ব লাভ করিলে উল্টাডিঙ্গীতে পাটের আড়ত-পটির কাছে জ্যোতিষ গণনালয় খুলিয়াছে; শুনিয়াছি, বেশ পসার করিয়া ফেলিয়াছে। ভাগ্যকে যাহারা অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের হাতে ধরা দেন; অভাগা স্কুলমাষ্টারদের পানে কেহই চাহে না। হাত লইয়া সুরেশ দু'চারবার টিপিয়া ঘাড় নাড়িত ও বলিত, বাঃ বেশ 'কলার'টি ত! কখনও কাহারও কাহারও 'কলার'টির নিন্দাও করিত। তাহার ধরণ-ধারণগুলি আমার মনে ছিল।

বলিলাম, গণেশের হাতের কলারটি ত বেশ।

গণেশ প্রশ্ন করিল, তার মানে?

তার মানে, তবেই ত মুস্কিল! মানে যে কি তাহা জানিতাম না, কিন্তু এখন জানি না বলিলে সব পণ্ড হয়। বলিলাম, হাতের রং ভাল হলে রেখা ভাল হয়। তা, তুমি কি জানতে চাও, বল?

—দেখ ত, বিয়ের রেখাটা!

—হুঁ।

রুটি সেঁকার মত তাহার শুকনো হাতখানা এপিঠ ওপিঠ করিয়া উল্টাইয়া, পাল্টাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, বিবাহ আসন্ন।

গণেশ প্রসন্নমুখে বলিল, একটা সম্বন্ধ এসেছে, দেবগণ·········

আমি বলিলাম, এই ত রেখাও স্পষ্ট!

গণেশ বলিল, ঐটে নাকি বিয়ের রেখা? তবে যে লোকে বলে, এইটে বিয়ের দাগ!

এই সারিয়াছে ! ওরে সুরেশ ! তুই কোথায়ে !

গণেশ তাহার হাতটা কাৎ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্নপার্শ্বের যে দাগ তাহাই দেখাইল।

ঘটেই ভ ! এই সামান্ত ভুলটা যে কিরূপে করিয়া বসিলাম। ছিঃ ! কচি ছেলেও জানে বিবাহের দাগ, আমিও জানিতাম, অথচ প্রয়োজনের সময় উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলিলাম ! ছেলেদের পরীক্ষা দেওয়া আর কি। জানে সব, পরীক্ষা দিবার সময় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া বসে ! তাড়াতাড়ি বলিলাম, ইটালীদেশের জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, এইটা বিয়ের রেখা।—নিজের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখাটা দেখাইলাম।

গণেশ ইটালীর মুসোলিনীর বা জার্ম্মানীর হিট্‌লারের খবর রাখিত না, হয়ত তাহাদের অস্তিত্বই অজ্ঞাত, সহজেই বিশ্বাস করিল, বলিল, ওঃ। তা কি বুঝছ ?

হেডমাষ্টারের বন্ধু সুরেশের অনুকরণে অনেকক্ষণ গবেষণা করিবার পর প্রশ্ন করিলাম, তোমার বয়সটা ঠিক কত বল ত ?

একত্রিশ।

একত্রিশ ! দাঁড়াও। এই হল পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ,, চল্লিশ—হাঁ, ত্রিশ হইতে একত্রিশের মধ্যে বিবাহ, নির্ঘাৎ।

ঠিক দেখছ ?

স্পষ্ট।

গণেশ বলিল, আচ্ছা ছেলেপুলে ক'টা বল ত ?

আবার বিপদ ! এবার সহজেই বিপদ কাটাইয়া উঠিলাম, বসিলাম, ছেলেপুলের কথা আজকাল বলা শক্ত।

কেন ?

দেখছ না দেশশুদ্ধ লোক জন্মনিরোধ কর, জন্মনিরোধ কর—বলে চেঁচাচ্ছে। খোদার উপর খোদকারী করছে। দেশকে রসাতলে পাঠাবার চেষ্টা করছে। পাঁচ বছরে নাকি পাঁচ কোটী লোক বেড়ে গিয়েছে। আরে, খাবার-দাবারের দুঃখু ত সেই জন্যেই ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে চলেছে কি-না ! তাই এখন সকলেই একবাক্যে চিল্লাতে সুরু করেছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নইলে আমাদের দুঃখে বনের শেয়াল কুকুরেরাও ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। এই দেখ না তুমি,

আইন হল বলে—বেশী ছেলেমেয়ের বাবা বা মা হলে জেলে যেতে হবে। ঝাড়ু মার স্বাধীনতার মুখে, দু'দশটা ছেলেমেয়ে যে বাবা বাবা করে ঘিরে দাঁড়াবে পোড়া দেশের কর্তাদের তা'ও সইছে না।

গণেশ বলিল, তা যা বলেছ জামাই! খবরের কাগজ খুলেছ কি ওরই বিজ্ঞাপন! আরে, দেশের লোক কমিয়ে লাভটা কি হবে বল্ ত শুনি! কথায় বলে ধনবল, জনবল। জনবল না থাকলে কখন ধনবল হয়?—পাগল আর কি! ওসব আমি কোনদিন মানিনে জামাই……

পাছে শালী শালার সংখ্যা নির্ণয় করিতে বলে, তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা নামাইয়া দিয়া বলিলাম, মেয়েটি দেখতে কেমন?

মন্দ নয়, গেরস্থ ঘরের মেয়ে যেমন হয়, পাঁচপাঁচি!

দেবগণ ত?

হ্যাঁ।

তবে আর দেরী কর না।

গণেশ বলিল, মা ১৯শে বোশেখ দিন ঠিক করেছে।

আনন্দ প্রকাশ করিলাম।

২

এক বৎসর পরে শশুরালয়ে গিয়াছি, স্ত্রীকে আনিতে। গণেশ খবর পাইয়া আসিয়া হাজির। গণেশের বিবাহিত জীবনটা সুখের হয় নাই, এ সংবাদ আমার সুশীলা পত্নী পত্রযোগেই দিয়া রাখিয়াছিলেন। "কলাবৌটি" কিছু খরপ্রকৃতির; কলহে তাঁহার জোড়া নাই। গণেশের মা দুর্গাঠাকুরাণী কাশী পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। গণেশ থালা ঘটী বাটী ভাঙিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। এ সকল সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম।

গণেশ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, জামাই হাতটা দেখ ত!

ঐ রে! মুখটি কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম, হাত দেখা ছেড়ে দিইছি গণেশ!

কেন, ছাড়লে কেন জামাই ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, সে এক মস্ত করুণ ইতিহাস, গণেশ। বলতে গেলে আমার বুক ভেঙে যায়। একজনের সম্বন্ধে একটা কথা বলে ফেলে, না গণেশ, আমার চোখে জল আসছে !

গণেশ বোধ হয় আমার চোখের আসি-আসি জল দেখিয়া ফেলিল, করুণকণ্ঠে কহিল, তবে থাক্।

বাঁচিয়া গেলাম। বলিলাম. আচ্ছা গণেশ, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার নাকি বনি-বনাও হচ্ছে না ?

গণেশ বেবাক্ কবুল করিল, না।

—কেন ?

—মেজাজ খারাপ।

—কার ? তোমার না স্ত্রীর ?

গণেশ চক্ষুর ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দিল যে, তাহার স্ত্রীর মেজাজ খারাপ।

আমি বলিলাম, আমি কিন্তু শুনেছি, তোমারই মেজাজ বেশী খারাপ।

গণেশ গরম হইয়া বলিল, আমি কি সেকথা অস্বীকার করছি না কি জামাই ? আমার রাক্ষসগণ, মেজাজ ত খারাপ হবেই।

আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিলাম, রাক্ষসগণ হলে মেজাজ খারাপ হয় নাকি ?

হতেই হবে। বলিয়া সে একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, কিন্তু দেবগণের মেজাজ যে এত বদ হয় তা ত জানতুম না।

দেবগণ কার ? তোমার স্ত্রীর ?

হ্যাঁ। কেন তোমার মনে নেই, সেই তুমি হাত দেখে বলে দিলে, একত্রিশ বছরে বিয়ের রেখা, তাই ত আমি তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে করে ফেললুম।

ও বাবা! সব দোষ এ-যে আমারই ঘাড়ে চাপাইতে চায় দেখি। ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, আজ তোমাকে হাত দেখাতে চাইছিলুম কেন জান ?

কেন ?

আমি সন্ন্যাস নোব মনে করছি। তাই জানতে চাই সন্ন্যাস-যোগের কথা হাতে আছে কিনা।

যোগ-বিয়োগের দিক দিয়াও গেলাম না, বলিলাম, বনিয়ে নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব গণেশ?

একেবারে অসম্ভব জামাই, একেবারে অসম্ভব। এই কালকের রাত্রের ব্যাপারটাই দেখ না। যাত্রার দল নিয়ে তিনদিন আগে পাঁচপাড়ায় গেছলুম; তিন-দিন সেখানে গাওনা ছিল, খুব ভাল গাওনা হল, পাঁচপাড়ার বাবুরা পাঁচটা মেডেল দিয়েছেন, আমাকে একখানা শাল, কাল রাত দশটায় ফিরলুম। ফিরে দেখি খুড়তুত ভাইটি বিদেশ থেকে এসে চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে আছে। আমায় দেখেই প্রণাম করে পায়েরধুলো নিতে গিয়ে পড়ে গেল, ভোঁচকানী লেগে মূর্চ্ছা আর কি! মুখ শুকনো, পেটটা ঢুকে গেছে, ধুঁকছে, যেন পাঁচ সাত দিন খায়নি। জিজ্ঞেস করলুম, খেয়েছিস্? কেঁদে ফেল্লে। অন্দরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম, কেবলা কখন এসেছে? বললে, কাল। বললুম খেয়েছে? বল্লে, জানি নে। জানিনে? বুঝছ জামাই, ব্যাপারখানা তুমি বুঝছ? আমার খুড়তুত ভাই না হয়ে ওনার খুড়তুত ভাই হলে রাতদুপুরেও পুকুরে জেলে নামত, বুঝছ ত? বললুম, খেতে দিতে পার নি? বললে, না পারি নি। সাতগোষ্ঠীর কুটুমবাটুমকে গেলাতে আমি পারবো না। বলে রান্নাঘরে আমার জন্যে ভাত বাড়তে গেল। আমি করলুম কি, একখানা চেলা কাঠ নিয়ে হাঁড়ীতে এক ঘা, থালা বাসনে আর এক ঘা! গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর সমস্ত রাত অন্ধকারে ও দেখায় কিল, আমি দেখাই ঘুঁসি, ও বাঁধে কোমর আমি বাঁধি মালকোঁচা, ও দেখায় রাঙ্গা চোখ, আমি করি দন্ত কিড়ির মিড়ির, ভোর রাত্রে ও নিয়ে এল বঁটি, আমি আনলুম দা। এই করতে করতে সকাল হয়ে গেল, বললে রাঁধবে না, আমাকে উনুনের পাশ দেবে, আমি বললুম তোর হাতে খাব না, সন্ন্যাসী হব। তারপর তোমার কাছে আসছি

হাসিব অথবা কাঁদিব মনে মনে সেই গবেষণা করিয়া, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কহিলাম, গণেশ, তবু বনিয়ে চলতেই হবে। হিন্দুঘরের স্ত্রী ত্যাগ করা ত চলে না। নিজে একটু নরম সরম হয়ে মানিয়ে চল, তা ছাড়া উপায় কি।

সে চেষ্টার আমি কসুর করি নে জামাই। বুনো মোষ কিছুতেই বশ মানে না।

তিনি যদি বুনো মোষ হ'ন, তুমিও বুনো শূয়র। তিনি শিঙ নাড়েন, তুমি গজদন্ত দেখাও।

গণেশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তা যা বলেছ জামাই! একটু থামিয়া আবার বলিল, আদরও ত কম করি নে জামাই। দেখ না পুজোর সময় তিন ভরি সোনার হার গড়িয়ে দিলাম। বললে কি জান? গিল্‌টির নয় ত? শুনে, আমার গেল মাথা খারাপ হয়ে, একটানে হারটাই ছিঁড়ে ফেললুম।

বেশ করলে!

আচ্ছা,—রাগ হয় না, তুমিই বল ত জামাই?

তা যে একটু হয় না, তা না বলতে পারি নে। তবুও বনিয়ে নিয়ে চলতে হবে গণেশ। এ ত আর মুসলমান খৃষ্টান নয় যে তাল্লাক দিলে বা ডাইভোর্স করলেই হয়ে গেল। বোঝা যখন বইতেই হবে, বুঝলে না?

তুমি কখন পাড়া-কুঁদুলী দেখেছ জামাই? দেখ নি? তারা যখন ঝগড়া করবার লোক পায় না তখন হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। আমার ঠাকরুণটিও দিন রাত প্যাঁচ কষছেন কি করে পায়ে পা বাধিয়ে আমার সঙ্গে এক পক্কড় লড়বেন। আমার হাড় জ্বালাতন মাস পোড়াতন হয়ে উঠেছে জামাই। মাঝে মাঝে সত্যিই ইচ্ছে হয় যেদিকে দু'চোখ যায় পালাই।

গণেশের কথাগুলার ভিতর দিয়া এমন একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইতেছিল যাহাতে তাহার কোন কথা অবিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরে গণেশ বলিল, জামাই তোমাদের শহরে একটা চাকরি বাকরি দিতে পার? চুলোর ছাই দেশ ছেড়ে পালাই, পাটি-খুটি, মাস গেলে বাড়ীতে ওদের টাকা পাঠিয়ে দিই। খিচি-মিচি আর সহ্য হয় না।

গণেশ চাকরি করিতে বিদেশ যাইবে ইহা কল্পনা করাও শক্ত। তাহার যাত্রার দল অচল হইবে, বেওয়ারিশ মড়ারা রাস্তার ধারে পড়িয়া পচিবে, গ্রামের ওলাউঠা, বসন্তে রক্ষাকালী পূজা বন্ধ হইবে, গণেশের গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া চলিতেই পারে না। সেই কথাই বলিলাম।

গণেশ করুণমুখে, কাতরকণ্ঠে বলিল, সত্যি জামাই, গ্রাম ছাড়তে আমার

বড় কষ্ট হবে, কিন্তু সারা জীবন ঘরের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা লড়াই করেই বা বাঁচি কি করে বল ?

আমাদের স্কুলে ড্রিল মাষ্টারের পদটি খালি ছিল। চেষ্টা করিলে গণেশকে লওয়া সম্ভব হইতেও পারে।

গণেশ ঢাকায় আসিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিল। আমার বাসার কাছেই স্কুলের একটা মেস্ ছিল, তাহাতে বাসা লইল। বলা বাহুল্য সে একলাই আসিয়াছে। সকাল সন্ধ্যা আমার বাড়ীতে বসিয়া গল্প-গুজব করে, দুই একদিন মুখ বদলাইবার জন্য তাহার গ্রামের মেয়ের হাতের রান্না খাইয়া যায়, আমার গৃহিণীও তাহার গ্রাম্য গণেশদাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করেন। জামাই হইলে গণেশ যে ইহার অধিক আদর পাইত না, একদিন সে কথা বলায় ভদ্রগৃহিণী তাঁহার সেই অনড়-অচল কথাটাই আমায় শুনাইয়া দিলেন, এবার যেন বুঝা গেল, আমাকেই দড়িটা গলায় দিতে বলিতেছেন !

৩

সত্য বলিতেছি প্রথম দিনকতক গণেশের মুখ দেখিলে আমার দুঃখ হইত। গ্রামের মাটি হইতে গাছপালা জনমানব কুকুরশেয়ালটা পর্য্যন্ত যেন দিনরাত তাহাকে ডাকিতেছে, গণেশ তাহাদের সেই আকুল আহ্বান যেন স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছে। গণেশ আমার স্ত্রীর নিকট বলিয়াছে, রাত্রে তাহার ঘুম হয় না। বালিশে মাথা রাখিলেই সারা গ্রামখানা গণেশ গণেশ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার সামনে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে চাহিয়া থাকে। আমার বুদ্ধিমতী স্ত্রী তাহাকে বৌ আনিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোল্লারা মস্জিদ্ পর্য্যন্তই দৌড়িতে পারে।

সাধারণ লোক যাহাকে dutiful বা কর্ত্তব্যপরায়ণ বলে, গণেশ তাহারও অধিক। স্কুলের সে ড্রিল মাষ্টার, ড্রিল করাইয়াই সে খালাস, কিন্তু গণেশ তাহার অনেক বেশী কাজ করিত। যে-কোন মাষ্টারের যে-কোন কাজ বাকি পড়িয়া থাকিত, গণেশ স্বেচ্ছায় তাহা চাহিয়া লইয়া করিয়া দিত। যে-কোন ক্লাশের যে-কোন বিষয়ের শিক্ষক অনুপস্থিত হইলে, গণেশ সেই ক্লাশ লইতে যাইত এবং

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তক-সম্বন্ধীয় গল্প করিয়া ছেলেদের তুষ্ট করিয়া আসিত। কাজে-কর্ম্মে যখন লিপ্ত থাকিত, লক্ষ্য করিতাম সে বেশ থাকিত, অবসরকালেই যত বিপদ। তাহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় ম্লান হইয়া আসিত, মুখের চেহারা বদলাইয়া যাইত, ভাব-ভঙ্গী হইতে প্রাণের স্পন্দনটুকু লুপ্ত হইত। আমার সুগৃহিনী বলিতেন, গণেশদা কথা শুনবে না ত! কিন্তু আমি বুঝিতাম, সেই পানা-পুকুর, সেই বন-জঙ্গল, সেই যাত্রার দল, সেই বেওয়ারিশ মড়ারা, অসহায় রোগীর দল তাহাকে ঘন ঘন ডাক দিতেছে।

জুন মাসে আমাকে দু'মাসের জন্য বরিশালের স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত করিয়া বদলী করা হইল। খবর শুনিয়া মাষ্টারদের মধ্যে কেহ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কেহ বক্ষঃব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন, কেহ বা দেঁতো হাসি হাসিলেন। দেখিলাম গণেশের চক্ষু ছল ছল করিতেছে, সে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িল। যাইবার দিন বলিলাম, গণেশ, মন খারাপ কর না যেন। তোমার ত সকলের সঙ্গেই ভাব হয়ে গেছে, আর দু'মাস বই ত নয়, আমি ফিরে আসছি। লক্ষ্মী, মন খারাপ কর না।

গণেশ ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, সেজন্যে মন খারাপ করছি নে জামাই। দু'মাস কেন, তুমি বরাবরের জন্যে হেডমাষ্টার হলেই ত আমাদের আহ্লাদ জামাই। তাতে মন খারাপ করব কেন? কিন্তু আমি যে বড় বিপদে পড়েছি জামাই—তুমি ছাড়া—বলিয়া সে আবার কাঁদিয়া উঠিল।

কি বিপদ?

এই দেখ, বলিযা গণেশ তাহার পিরিহানের জেব হইতে একখানি রেজিষ্ট্রি চিঠি বাহির করিযা দিল।

খুলিয়া দেখি, তাহার স্ত্রীর লেখা। চিঠিখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। কোন ভদ্রনারী, ভদ্রস্ত্রী যে এরূপ পত্র লিখিতে পারে চোখে না দেখিলে—কোন অতিবড় সত্যবাদী লোক তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে লইয়া শপথ করিলেও বিশ্বাস করিতাম না। পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া নারীর কলঙ্কের পরাকাষ্ঠা ছাপার হরফে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হয় না। মোদ্দা কথা এই যে, গণেশের স্ত্রী নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছে যে গণেশ শহরে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের—শাঁখিনী ডাকিনীদের সহিত নানারূপ বৈধ ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাকে

অবহেলা করিতেছে। শীঘ্রই সে ইহার প্রতিকারের উপায় চেষ্টা করিবে। রেজিষ্ট্রি চিঠি তাহারই নোটিশ। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

গণেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ, কি করবে?

গণেশ ম্লান মুখে হাসিয়া বলিল, সামনে রাজার জন্মদিনে ছুটি আছে, গিয়ে নিয়ে আসি।

সেই ভাল!

গণেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, ভাল যে কত, সে আমিই বুঝছি জামাই।

৪

একবৎসর পরে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

গণেশ আমাদের জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গণেশের স্ত্রী এইখানেই আছে। মাসখানেক হইল তাহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

আমার গৃহিণী হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, দেখলে গণেশদা, আমার পরামর্শ শুনলে ভাল হয় কিনা।

গণেশ কোন কথা বলিল না।

নিরিবিলি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ, এখন আর ঝগড়া-ঝাঁটি হয় না তো?

না।

দুইহাতে গণেশের দুইহাত চাপিয়া ধরিলাম। সত্য সত্য বড় আনন্দ হইল। গণেশের মত উচ্চ মন, উদার হৃদয় ব্যক্তির দাম্পত্য জীবনে যে সুখশান্তির লেশমাত্র ছিল না ইহাতে কার প্রাণে না কষ্ট হইত? যে শুনিত সেই দুঃখ অনুভব করিত।

বলিলাম, ছেলেমেয়ে হলেই অতি উগ্রস্বভাব স্ত্রীলোকের প্রকৃতিও নরম হয়,

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাই বলেন। ছেলেটিই তোমার ঘরে শান্তি এনেছে বলতে হবে। ছেলের নাম রাখ, শান্তিপ্রকাশ।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

একদিন ক্লাশ শেষ করিয়া আফিস ঘরে আসিয়া দেখি, শিক্ষকগণ গণেশকে লইয়া পড়িয়াছেন। গণেশ ভোর ছ'টায় স্কুলে আসে, বেলা সাড়ে ন'টায় একবার খাইতে যায়, আবার সাড়ে দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসে এবং রাত্রি দশটার আগে স্কুল হইতে যায় না। তাহারই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্কুলের দ্বিতীয় কেরানীটির মৃত্যু হইলেও কেরানী লওয়া হয় নাই—গণেশ সেই কাজও করিতেছে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত বেতনের দাবীও তাহার নাই। শিক্ষকগণের সমক্ষে এই সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে বাসায় স্ত্রী পুত্র থাকিতেও গণেশ বাসায় থাকিতে বিমুখ কেন? গণেশ বলিতেছে, সে কাজ-পাগল, কাজ লইয়াই ভাল থাকে। ইহাতে তাহার স্ত্রী-পুত্রের আপত্তি হইবে কেন?

আমাকে সকলে সালিশ মানিলেন। আমি বলিলাম, ও পাগলের কথা ছেড়ে দাও। ওটা বদ্ধ পাগল। দুই একদিন পরে সদরালাবাবুর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার সময় স্কুলের আফিস ঘরের জানালায় আলো দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, গণেশ দ্বিতীয় কেরানীর কাজ করিতেছে; গিয়া তাহাই দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া গণেশ চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; একটু হাসিয়া আবার রেজেষ্টারীতে রুল টানিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ বাড়ী যাবে না?

গণেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, এগারোটার সময় যাই।

খাও কখন?

ফিরে গিয়ে।

তার মানে, প্রায় বারোটা। এত রাত পর্য্যন্ত বাড়ীর লোককে হাঁড়ী নিয়ে বসিয়ে রাখ ত!

বসে থাকতে দায় পড়েছে! হেঁসেলে সকালের ভাত ঢাকা থাকে, গিয়ে পিদিম জ্বালি, খাই, শুয়ে পড়ি।

তোমার স্ত্রী কি করেন?

জানি নে।

জান না কেন ?

বোধহয় ঘুমোয়।

তোমার ছেলে ?

কোনদিন ঘুমোয়, কোনদিন জেগে থাকে, কাঁদে—আমি গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলোই।

তোমার স্ত্রী ওঠেন না ?

কি জানি, দেখি নে ত !

তোমরা কি আলাদা ঘরে শোও ?

হ্যাঁ।

আর একটা প্রশ্ন মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু করিলাম না, কারণ গণেশের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকিলেও গণেশ বড় সমীহ করিয়া কথা বলিত। অন্য প্রশ্ন করিলাম—কতদিন এ ব্যবস্থা হয়েছে ?

গণেশ বলিল, ঢাকায় এসে পর্য্যন্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা আছে ত ?

গণেশ বলিল, না।

যা ভাবিয়াছি, তাই ! বলিলাম, কতদিন ?

এখানে এসে পর্য্যন্ত।

একটু আধটু······

একদম না।

একদম না ?

একদম না !

গণেশ নিবিষ্ট চিত্তে রুল টানিতে লাগিল। একটি বড় বা একটী ছোট না হয়, কোনটি বাঁকাচোরা না হয়, কোনটি মোটাসরু না হয়—অতি সন্তর্পণে,অতীব সযত্নে রুল টানিতে লাগিল। যেন কিছুই হয় নাই। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া আকাশ পাতাল, স্থাবর জঙ্গম, ম্যাপ, গ্লোব, রুল, ব্লটিংপ্যাড, ঘড়ি, পিতলের পেটা ঘণ্টা, জলের কুঁজো, এনামেলের গেলাস সব ভাবিতে লাগিলাম।

গণেশ হঠাৎ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমার স্ত্রীরও রাক্ষসগণ, জান জামাই ?

'গণে'র কথাটা মনে ছিল না, হঠাৎ মনেও পড়িল না ; নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, বিয়ের সময় ওদের লোকেরা বলেছিল, দেবগণ, মনে আছে ত ? সেই যে তোমায় হাত দেখাতে গেছলুম।

হাঁ৷ হাঁা, মনে পড়ছে বটে !

ওরা মিছে কথা বলে আমার ঘাড়ে ঐ রাক্ষসগণ মেয়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এবার ঢাকায় আসবার সময় ওর পোর্টম্যাণ্টোর ভেতর থেকে ওর ঠিকুজি বেরিয়ে পড়ল। কিছুতেই দেখাবে না, জোর করে কেড়ে নিয়ে দেখি, রাক্ষসগণ।

তাতে কি ?

তুমি কি বলছ, জামাই ? আমারও রাক্ষসগণ, ওরও রাক্ষসগণ। চুলোচুলি ত হবেই।

ওসব আজকাল কেউ মানে না।

মানে না বলেই ত এত দুঃখ।

দু'জনেই অনেকক্ষণ নীরব, তারপর গণেশই নীরবতা ভঙ্গ করিল। বলিল, কথা কইলেই বিপদ, হাতাহাতি লেগে যায়। যাই কেন বলি না, তার উল্টো মানে হয়ে পড়ে। আমার সব কাজ খারাপ, আমার সব কথা মিথ্যে, আমার সব বন্ধু বদ, আমার মাষ্টারী বদ, ছাত্র বদ, আমি বদ, আমার খাওয়া বদ, শোওয়া বদ, আমার মা-বাপ বদ, যদি বলি না, বদ নয়, অমনি ঝাঁ-কড়াক্কড়, ঝাঁ-কড়াক্কড় ! তাই কথা বন্ধ করে একরকম আছি মন্দ নয়। চান্ করে পিঁড়িতে বসি, যেদিন পাই খাই, যেদিন না পাই, স্কুলে চলে যাই। রাত্রেও গিয়ে যেদিন দেখি ঢাকাখানা মাটিতে নামান আছে খুলে যা পারি খাই, যেদিন দেখি ঢাকা সিকেয় তোলা, সেদিন চুপচাপ শুয়ে পড়ি।

তেমনও হয় নাকি ?

প্রায়ই হয়।

কথা কওনা বলেই ওরকম হয়, কথা কয়ে দেখ, রোজ গরম ভাত থাকবে।

তা জানিনে, কিন্তু চুলোচুলি হবে যখন, তুমি কি সামলাতে আসবে জামাই ?

নেপোলিয়ঁা বা নেলসন নই, যুদ্ধের নামে রক্ত ধমনী মধ্যে নৃত্য করে না, তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, রাক্ষসগণে রাক্ষসগণে মিলন হলে ঐ-ই হয় জামাই। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যে হয় না।

অদম্য কৌতূহলের প্রবাহ তরঙ্গ তুলিতেছিল, নিবারণ করিতে পারিলাম না। বর্ষার খরস্রোতকে বাঁধ দিয়া কভু কি আটকান যায়? বলিলাম, আচ্ছা গণেশ, তোমাদের চলে কি করে?

গণেশের মুখখানা হঠাৎ আরক্ত হইয়া উঠিল দেখিয়া মনে মনে লজ্জা অনুভব করিয়া আমার বক্তব্যটা ঘুরাইয়া অন্যভাবে ব্যক্ত করিলাম—কেউ ত কারুর সঙ্গে কথা কও না, সংসার চলে কেমন করে?

গণেশ তাচ্ছিল্যভরে কহিল, চলে যায়। ভারি ত সংসার, তার আবার চলা আর অচলা। শুধু দুঃখ এই, ছেলেটা বোবা!

সত্যই দুঃখের কথা কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক; বলিলাম, তবু ধর, সংসারের জিনিসপত্তর—কোন্‌দিন কোনটা চাই, কি আনতে হবে—

কেন? ওটা এমন আর শক্ত কি জামাই? ধর, তেল ফুরিয়েছে, গিন্নী দুম্ করে তেলের কেঁড়েটা বার করে দিয়ে বলে গেলেন, তেল নেই। আমি তেল কিনে রান্নাঘরের দরজার কাছে দুম্ করে বসিয়ে বলে দিলুম, সরষের তেল, আড়াই পোয়া। ধোপা ছিল না, কাপড়চোপড় বড্ড ময়লা হয়েছিল, আমি যখন রান্নাঘরে খেতে বসতুম, বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে তিনি তখন রাজ্যের মুখপোড়া কাপড়কাচাদের যমরাজের হাতে তুলে দিতেন; এক একদিন আমাকেও যে তাদের সহযাত্রী করতেন না, তা নয়। নতুন জায়গা, শহর দেশ, যাকে তাকে ডেকে ত আর কাপড় দিতে পারিনে, ক'দিন তাই ধোপা খুঁজতে দেরী হয়ে গেছল। তাই—

ধর, তোমার দু'টি ভাত চাই, তুমি কি করবে?

চাইলেই হল আর কি! চাইব না।

—চাইবে না?

—না। প্রথম প্রথম দু'একদিন ভুল করে চেয়ে ফেলেছিলুম জামাই। দুপ্ দাপ্ শব্দ করে—রান্নাঘরে ঢুকে খটাস্ করে হাঁড়িটাই দিলে সামনে বসিয়ে। হাঁড়িটা ভাঙ্গল, আমাকেও ভয়ে ভয়ে উঠে যেতে হল।

এই দু'বছরের মধ্যে তোমার কি অসুখ-বিসুখ করে নি?

কেন করবে না? তুমিও বরিশাল গেলে, আমারও চৌরঙ্গী বাত, শয্যা নিতে হল।

কি খেতে, কে সেবা করত?

কেন, স্কুলের মালী তারণ।

তুমি বাড়ীতে ছিলে না?

না।

বল কি?

তোমার কাছে মিথ্যে বলব কেন, জামাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, মাসখানেক পরে যখন বাড়ী ফিরলুম, শুনলুম তিনি দণ্ডানন ভগবানের মুখে পুনঃপুনঃ অগ্নিসংযোগ করে দুঃখু জানাচ্ছেন কেন তিনি তাঁর স্বদেব বৈধব্য ঘটালেন না!

বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের দত্তবাড়ীর দেবেন্দ্রকে যে লোক পাঠকের নিকটে সুপরিচিত দেবেন্দ্র দত্তে পরিণত করিয়াছিল, সেই হৈমবতীকে আমাব পুনঃপুনঃ মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিলাম, শুধু কল্পলোকে নয়, বাস্তবজগতেও হৈমবতীর অভাব নাই।

গণেশ আবার বলিল, দু'একদিন কথার জবাব দিয়ে দেখিছি, লড়াই সুরু হয়ে যায়, পাড়ার লোক জমে যায়, আলসেয আলসেয় পাশের বাড়ীগুলোর মেয়েরা উঁকি-ঝুঁকি দেয়—দেখে শুনে এইখেনে চাবিকাটি দিইছি। ঠিক করিনি জামাই? বলিয়া সে ঠোঁটদু'খানার উপরে গোটা দুই তিন অঙ্গুলি স্থাপন করিল।

কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক আমার মত মূঢ়ের পক্ষে বলা সুকঠিন, আমিও মুখে চাবিকাঠি দিয়াছিলাম। গণেশ বলিল, অনেক ভেবেচিন্তে দেখিছি জামাই, চুপ থাকাই ঠিক, বোবার শত্রু নেই।

আরও এক বৎসর কাটিয়াছে, গণেশের জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। তেমনই ভোর ছ'টায় স্কুলে আসে, সাড়ে ন'টায় যায়, আবার সাড়ে দশটায় আসিয়া রাত্রি এগারটায় ফিরে। আমাকে গোপনে বলিয়াছে, দীর্ঘ দুই বৎসর কালের মধ্যে একটি কথাও সে বাড়ীতে কয় নাই।

জানি না গোপনে আর কাহাকেও কথাটা সে বলিয়াছিল কিনা অথবা আমার গৃহিণী Secret betray গোপনতার অপব্যবহার করিয়াছেন কিনা, স্কুলের শিক্ষকগণ গণেশের নামকরণ করিয়াছেন, মৌনীবাবা !

তৃতীয় বৎসরে দেখিলাম গণেশ তাহার বোব ছেলেকেও অভিনিবেশ সহকারে কলটানা শিখাইতেছে। চতুর্থ বৎসরে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, তাহা অভাবনীয়। গণেশ স্কুলেও কথাবার্ত্তা কয় না। ড্রিল্ করাইতে 'ওয়ান,' 'টু', 'থ্রি', এবং 'রাইট', 'লেফট' এই শব্দ কয়টি ছাড়া অন্য কথা সে আদৌ বলে না। পঞ্চম বৎসরে ড্রিল মাষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া শুধু কেরানীগিরি করিতেই চাহিয়াছিল, আমি রাজী হই নাই—কেরানীর মাহিনা অনেক কম। গণেশ 'ওয়ান্,' 'টু,' 'থ্রি' করিতে লাগিল—খুব অনিচ্ছার সহিত। ইদানীং সে চুলগুলাও একটু বড় বড় রাখিযাছে, যে জামাটা গায়ে দেয, সেটার রং কতকটা বাদামী, কতকটা গেরুযা। ছাত্রদলও গোপনে মৌনী-মাষ্টার বলিতে সুরু করিয় ছে।

গণেশ বারম্বার বলিত, রাক্ষসে রাক্ষসে অহরহ লড়াই হইলেও জয় পরাজয় নির্ণয়ের সম্ভাবনা কখনই নাই, কেহ কাহাকে খাইতে পারিবে না, কেবল ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই অদৃষ্টলিপি। মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি, কথাগুলার সত্যতা সপ্রমান করিতেই যেন ঐ দুই রাক্ষস-রাক্ষসী দীর্ঘ দ্বাবিংশ বর্ষ দ্বন্দ্ব করিল, তারপর প্রায় একইদিনে একই সময়ে ভবলীলা সম্বরণ করিল। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। গণেশ স্কুলের খাতায় কল টানিতেছিল, পাশেই বাসা, তাহার স্ত্রী বাটনা বাটিতেছিল, বর্ষাকাল, সন্ধ্যারাত্রি, একটা বাজ পড়িল—বোবা ছেলেটা আমার বাড়ীতে ছিল, পৌঁছাইযা দিতে গিয়ে দেখি, রাক্ষসও নাই রাক্ষসীও গিয়াছে। ছেলেটি অনেকক্ষণ কাঁদিযা কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এক চিতায আদর্শ দম্পতীকে দেবলোকে প্রেরণ করা হইল। সংস্কৃতের পণ্ডিত মহাশয় দেবভাষায় অপূর্ব্ব ও অভিনব কবিতা রচনা করিয়া শ্মশানবন্ধুদের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হায় ! দানবলোকে দেব-ভাষার আদর কোথায় ? কেহই ছাপিল না। কাজেই গণেশের জীবনীকার হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন আমাকেই করিতে হইল।

ফল্গু

বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম তথ্যটা সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের সময় হইতে জানে অনেকেই, কিন্তু বিষে অরুচি হইয়াছে খুব কম লোকেরই এবং নীলকণ্ঠ হইবার আগ্রহ নাই এমন বিপত্নীক বৃদ্ধের সংখ্যা আরও কম।

শিবশঙ্কর মিত্র বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিল এবং যাহাকে বিবাহ করিল সে প্রকৃত প্রস্তাবে তরুণী। কাজটা খুবই অন্যায়, তাহা সেও বুঝিল, অন্যেও বুঝাইল। বেশী করিয়া বুঝাইয়া দিল, তাহার কন্যা অলকনন্দা। বাপের বিয়ে অনেকেই দেখে নাই, সুযোগের অভাব বলিয়া ; দুর্ব্বিপাকবশতঃ যদিই কাহারও সুযোগ ঘটে, এমন একটা কৌতুককর ব্যাপার, কেহই দেখিতে চায় না। অলকনন্দা ইহাদের একজন। বিবাহের দিন দুই আগে শ্বশুরবাড়ী হইতে অবরুদ্ধশ্বাসে পিত্রালয়ে আসিয়া বাপের শয্যাগৃহ হইতে তাহার মায়ের ছবি ও ভাই আলোককে লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ফিরিয়া গেল। বাপের সঙ্গে দেখাটাও করিল না। শিবশঙ্কর একটা বিষম ধাক্কা খাইল বটে, কিন্তু ফিরিল না। যাহারা সমুদ্রস্নান করে, তাহারা ধাক্কা খায়, নাকানী চুবানী খায়, উল্টিয়া পাল্টিয়া পড়ে, তবুও ঢেউ লইতে ছাড়ে না।

সুমিত্রা জানিয়াছিল, সপত্নীর গর্ভজাত এক কন্যা ও এক পুত্র আছে। কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বড় ঘরে পড়িয়াছে ইহাও সে শুনিয়াছিল, ছেলের বয়স ছ'সাত, ইহাও জানিয়াছিল। এ বাড়ীতে আসিয়া একটি হৃষ্টপুষ্ট সুকুমারদর্শন বালককে দেখিবার জন্য তাহার ঐকান্তিক আগ্রহের অবধি ছিল না। বড়লোকের বাড়ী, লোকজনের সমাগম মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্বামীর চেহারার সঙ্গে মিলে, তাহার নিজস্ব কল্পনায় আঁকা সেই ছেলেটিকে কোথায়ও দেখিতে পাইল না। মেয়ের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ ছিলই। সে যে শ্বশুরালয় হইতে ঘটা করিয়া বিমাতা বরণ করিয়া লইতে আসিবে না ইহা জানা কথা। কিন্তু মাতৃহারা ঐটুকু শিশু যে বাপকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে একথা সে কল্পনা করিতেও পারে নাই। আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা যত প্রবলই হোক, এ এমন কথা যে কাহাকেও মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। কি জানি যে কথাটা শুনিতে আশঙ্কা,

পাছে সেইটাই শুনিতে হয়। কত ছেলে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে,খাইতেছে, খেলা করিতেছে, কাঁদিতেছে, কিন্তু ছুটিয়া গিয়া বুকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা জাগে, এমন ছেলে ত একটিও চোখে পড়িল না। সেদিনটা গেল, পরের দিন রাত্রে শিবশঙ্করের সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ হইল :

সুমিত্রা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল—দিদির একটি ছেলে ছিল না ?

শিবশঙ্কর বলিল : আলোকের কথা বলছ ? সে তার দিদির বাড়ী গেছে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল : কবে গেল ? দু'চার দিনের মধ্যে বোধ হয় ?

শিবশঙ্কর জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পুনরায় কহিল : আমাকে দু'দশদিন দেখে ছেলেটিকে বাড়ী ছাড়া করলেই পারতে!—কথাগুলার মধ্যে আর যাহাই থাকুক না, নব পরিণীতা নারীর কোমলতা ছিল না। শিবশঙ্করের পক্ষে সত্য উত্তর ছিল, একথা বলিলেই পারিত যে, যে লইয়া গিয়াছে তাহার মত না লইয়াই সে সেই কাজ করিয়াছে, এমন কি তাহার সহিত দেখা করার দরকার বোধও করে নাই। হয় ত এই জবাবই সে দিত কিন্তু শুনিবে কে ? যাহাকে শুনাইবে, তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া সে ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ফুলশয্যা নিশীথে এমন কাণ্ড অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটিলেও, যে কোন যুবকের পক্ষে মানিনীর মান ভঙ্গের জন্য দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিতে হয় না ; কিন্তু শিবশঙ্করের নিকট কোন উপায়ই সহজ ও সুলভ ছিল না। কাজেই বেচারী বারকতক আজে বাজে কথায় আদর করিবার চেষ্টা করিয়া যখন শুনিল, সুমিত্রা অতিমাত্রায় নিদ্রাকাতর হইয়া পড়িয়াছে, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসটা সংগোপনে চাপিয়া ফেলিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

প্রথম রাত্রিটা যে ভাবেই কাটিয়া থাকুক, তাহার পর অন্তহীন সংসার সমুদ্রের এই দুইটি অসম যাত্রীর জীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গতিতেই প্রবাহিত হইয়াছে, এতটুকু এদিক ওদিক হয় নাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই দপ্তর-খানার হিসাবের খাতায় এবং শিবশঙ্করের ব্যাঙ্কের চেক্ বহিতে সুমিত্রা দেবীর সহিটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইয়াছে। সংসারের অনাবশ্যক বস্তুকেও যেমন ফেলিয়া দেওয়ার রীতি নাই, রাখিয়া দেওয়াই প্রথা, শিবশঙ্করকে কেহ ফেলে নাই। তিনি আছেন ; কিন্তু ঐটুকু—আছেন মাত্র।

দুই

অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। এই আঠারো বৎসরে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন, কত বিবর্ত্তনই হয় ত হইয়াছে, কিন্তু শিবশঙ্করের সংসারে তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সমরেশের আবির্ভাব ছাড়া অন্য পরিবর্ত্তন বিশেষ ঘটে নাই। আলোক অথবা আলোকের কথা এ বাড়ীতে বড় আলোচিত হয় না—বাপ করে না, বিমাতা ত নয়ই। তবুও একথা ঠিক, খবরটা দু'জনেই রাখে। কেমন, তাহা বলি।

সেবার যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সুমিত্রা একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া আনন্দিত কণ্ঠে বলিল, আলোক স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করেছে, দেখেছ?

শিবশঙ্কর বলিলেন, ক'দিন আগে তার চিঠি পেয়েছি। সুমিত্রার হাসিমুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইল; বলিল, কৈ আমায় বল নি ত? চিঠি ত সব বাড়ীর ভেতরেই যায়, তার চিঠি, কৈ দেখলুম না ত!

শিবশঙ্কর অপরাধীর মত বলিলেন, পাঠাই নি ভেতরে? তাহলে ভুল হয়ে গেছে।

ভুল স্বীকার করিলে অপরাধের স্খালন হয়। সুমিত্রাকে নীরব দেখিয়া শিবশঙ্কর বুঝিল, একটা ঝঞ্ঝা কাটিয়া গেল।

ইহার দুই বৎসর পরে একদিন সন্ধ্যাকালে শিবশঙ্কর বলিলেন, আলোক ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে, পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পেয়েছে।

সুমিত্রা কহিল, শুনিছি, সরকার মশাই বলছিলেন।

সংবাদটা টেলিগ্রাফে আসিয়াছিল, সরকার তখন উপস্থিত ছিল। শিবশঙ্করের দুই বৎসর আগের কথা মনে ছিল, ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। সুমিত্রা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিল, সরকার মশাই বোধহয় ভাবলেন কি জানি বাবু বলেন কি না বলেন, ভাল খবরটা বাড়ীর ভেতর দিয়েই দিই! বলিয়া চলিয়া গেল।

সরকারের উপর শিবশঙ্করের একটু রাগ হইল। তাহার কোনই অন্যায় হয় নাই তাহা ঠিক; কিন্তু—থাক্। সরকারকে অন্য কথা প্রসঙ্গে ধমক দিয়াই বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সব তাতে সাওখুড়ি কর কেন হে!

সরকার কথাটাও বুঝিল না, ধমকটার হেতুও নির্ণয় করিতে পারিল না। আজ তাহার দিনটা ভাল যাইবে ইহাই ধারণা ছিল। বাবুর বড় ছেলের পাশের খবর বাড়ীর মধ্যে দিয়া দশ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, বাহিরেও কিঞ্চিৎ আশা ছিল, তা না হইয়া ধমক খাইয়া লোকটা খানিকটা দমিয়া গেল। গৃহিণীমাত্রেই সংবাদ-লোলুপ, ইহা কে না জানে? চাকর-বাকর সরকার গোমস্তারাই তাঁহাদের নিকট যাবতীয় সন্দেশ বহন করিয়া থাকে, ইহাতে দোষও নাই, বৈচিত্র্যও নাই। সে বেচারা জানিবে কোথা হইতে যে এমন সংবাদ থাকিতেও পারে যাহা একটি মাত্র লোক ছাড়া অন্যে সরবরাহ করিলে অতীব শান্ত প্রকৃতির গৃহিণীরও বরদাস্ত হয় না।

সুমিত্রা আলোকের সংবাদ রাখিত ইহা জানা গেল; কিন্তু কখন্ হইতে ও কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা জানাইতে হইলে আগের কথা একটু বলিতে হয়। বিবাহের বছর দেড়েক পরে তাহার সমরেশ জন্মগ্রহণ করে। প্রসবকালে তাহার জীবন-সংশয় হইয়াছিল। শিবশঙ্করের আশ্রিত ও সম্পর্কিত পিসী কালীঘাটের কালীমাতার পূজা মানত করিয়াছিলেন; সুস্থ হইয়া সুমিত্রা কালীঘাটে আসিয়াছিল, সেই পিসী সঙ্গে ছিলেন।

একটা গলির মোড়ে, এক হিন্দুস্থানী দরোয়ানের হাত ধরিয়া একটি গৌরবর্ণ সুকুমার বালক দাঁড়াইয়াছিল। নজর পড়িবামাত্র পিসী বলিয়া উঠিলেন, ওমা, ঐ যে আলো, তোমার সতীন-পুত।

সুমিত্রা যে কাণ্ড করিল তাহা আর বলিবার নয়! রাস্তার মাঝখানে, মোটর থামাইয়া, নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া বালককে বুকে তুলিয়া লইয়া মুখের উপর তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তোমার নাম কি বাবা? কার সঙ্গে এসেছ মানিক? আমি কে বল ত সোনা? তুমি কি পড় ধন আমার, লক্ষ্মী সোনা আমার, সোনার চাঁদ আমার, একটিবার মুখ তোল বাবা, দেখ-না, আমি যে তোমার—দেখবে না? এইরূপ একসঙ্গে একশত প্রশ্ন করিয়া নারী বালককে ত বিব্রত করিলই, পথচারীদেরও বড় অল্প বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল না।

হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা কলিকাতার ছেলেচোর ঠগ-জুয়াচোরদের কথা অনেক শুনিয়াছিল, লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়াও ছিল, কিন্তু এই স্ত্রীলোকের রূপের বিভা,

অলঙ্কারের শোভা—বিশেষ করিয়া চোখের জল দেখিয়া লাঠিসম্বদ্ধ হস্তের মুষ্টি শিথিল না করিয়াও পারিতেছিল না।

আলোক সব কটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেও নাই ; লজ্জায় রাঙা হইয়া মুখটা সবে খুলিতে সুরু করিয়াছে মাত্র, এমন সময় অলক আসিয়া মুহূর্ত্তমাত্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা পলকমাত্রে দেখিয়া লইয়া দৃঢ় গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, আলোক, চলে এস।

পিসী নিকটেই ছিলেন, ওমা অলক এসেছিস্, তাই ত বলি, খোকা এল কার সঙ্গে।

অলক সে কথার উত্তর দিল না, কাহারও দিকে চাহিল না, ভাইটির হাত ধরিয়া, লোকলস্করপরিবৃত হইয়া চলিয়া গেল।

সুমিত্রা তাহার দিকেও ধাবিত হইয়াছিল, অতিকষ্টে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সামনের সরু গলিটায় ঢুকিয়া পড়িয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

ও রাস্তা নয় বৌমা, ও রাস্তা নয়, গাড়ী যে এইদিকে গো—বলিতে বলিতে পিসী পশ্চাদনুসরণ করিলেন, সুমিত্রা সে কথা কানেও তুলিল না। একটু নির্জ্জনে চোখের জল ও রাজ্যের লজ্জা গোপন না করিয়াই বা পারে কেমন করিয়া ?

অলকের একটা কথা তাহার কানে গিয়াছিল, তাই তাহাকে ধরিতে গিয়াও যায় নাই, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলোকের 'ও কে দিদি, ও কে দিদি, ও অত কাঁদছিল কেন দিদি' এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে অলক বলিয়াছিল, 'কে আবার ! কেউ না, ডাইনী !'—ইহার পরে নারীর অন্তর্নিহিত সদাজাগ্রত মা'ও মরিয়া গিয়াছিল।

আলোক বলিয়াছিল, সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। সুমিত্রা সেইদিন হইতে হিসাব রাখিতেছিল, এবং যে বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা সেই বৎসরের পরীক্ষার ফল কোন্ কোন্ কাগজে বাহির হয় জানিয়া তাহার এক এক খণ্ড ক্রয় করাইয়া আনিয়াছিল।

একদিন শিবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল, আলোক ডাক্তারী পড়ছে ?

শিবশঙ্কর সামনের ড্রয়ারটা খুলিয়া চিঠি খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন, হ্যাঁ, তাই ত লিখেছে। চিঠিখানা গেল কোথায় ?

চিঠি আমি দেখিছি, সকালের ডাকের সঙ্গে ভেতরেই গেছল।

শিবশঙ্কর স্বস্তি লাভ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই পাঠিয়ে দিয়েছি বটে।

তুমি মত দিয়েছ?

আমার মত ত সে চায় নি!

তা চায় নি বটে কিন্তু যে কথাগুলো লিখেছে, তার উত্তরে তোমার বলবার কি কিছুই নেই?

কি কথা?

স্বাবলম্বী হতে হবে—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে—

কথাগুলো ত অন্যায় নয়।

সুমিত্রা বলিল, কিন্তু জীবিকা অর্জ্জনের খুব দরকার পড়েছে কি তার?

শিবশঙ্কর নতনেত্রে ধীরে ধীরে বলিলেন, দরকার পড়ুক আর নাই পড়ুক, উপার্জ্জনক্ষম হবার দরকার সকলেরই আছে। এ কথাটা ভুলে গিয়েই বাঙালীর আজ এত অধঃপতন।

সুমিত্রা আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। পরদিন সমরেশকে দিয়া আলোককে একখানা পত্র লিখাইল। চিঠিখানা সমরেশের হাতের লেখায়, তাহারই স্বাক্ষরে গেল বটে, কিন্তু লেখক তাহার এতটুকু ভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। সমরেশ লিখিয়াছিল:

"শ্রীচরণেষু,

দাদা আমি ম্যাট্রিক পাস করিয়াছি, আপনি বোধ হয় তাহা জানেন না। কাগজে দেখিবেন প্রথম বিভাগে কয়েকজনের নীচেই আমার নাম আছে। আমার ইচ্ছা যে আমাদের যে বিষয়সম্পত্তি আছে তাহা দেখি, আর পড়িয়া কি হইবে? এ বিষয়ে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আপনি যদি পড়িতে বলেন, পড়িব; যদি না বলেন, তবে আমাদের বৈষয়িক কার্য্য দেখিব। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। প্রণত: সমরেশ।"

আলোক এই পত্রের যে জবাব দিল, তাহা পাঠে সমরেশের মনের ভাব কি হইল জানি না, তাহার জননীর মুখভাব অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিল। আলোক লিখিল:

"প্রিয় সমরেশ, এই সকল গুরুতর বিষয়ে আমার পরামর্শ তোমার কোনই কাজে লাগিবে না। তোমার মা যাহা বলিবেন, তাহাই করা উচিত।—আলোক।

ইহার পরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; এই সময়ের মধ্যে কেহ কাহারও খবর রাখিল কিনা তাহা প্রকাশ নাই।

তিন

শিবশঙ্কর সদরে গিয়াছিলেন, মামলা-মকর্দ্দমার জন্য প্রায়ই যাইতে হয়। যে দিন যান, সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসেন। এবার তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। সন্ধ্যার সময় গৃহে এই মর্ম্মে 'তার' আসিল যে, অভাবনীয় কারণে ফিরিতে পারিবেন না। ফিরিতে দু'তিনদিন দেরীও হইতে পারে।

অভাবনীয় কারণটা কি তাহা অনুমান করিয়া লইতে বাড়ীর লোকের বিলম্ব হইল না। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার যাহাকে চালাইতে হয়, তাহার পক্ষে অভাবনীয় কারণে সদরে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু দিন চার পরে দেখা গেল, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অভাবিত কারণেই এবার শিবশঙ্করকে বাহিরে আটকাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। শিবশঙ্কর যখন গাড়ী-বারান্দার নিচে মোটর হইতে নামিলেন, তখন তাঁহার আগে আগে যে ব্যক্তি নামিল, একান্ত অপরিচিত হইলেও তাহার মুখের একটা দিক এবং ক্ষণমাত্র দেখিয়াই সুমিত্রা আনন্দ কলরব করিতে করিতে নিচে নামিয়া গেল। কিন্তু সবটা যাওয়া হইল না, মধ্যপথে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

নবীন খানসামা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, মা, কর্ত্তাবাবুর বসবার ঘরের পাশের ঘরটার চাবিটা দিন—বড়দাদাবাবু এসেছেন, সেই ঘরে বাবু তাঁর জিনিস-পত্র রাখতে বললেন। বড়দাদাবাবু সেই ঘরে থাকবেন।

সুমিত্রা কি যেন বলিতে চাহিল, আবার তখনই কিসের যেন আঘাত সামলাইয়া লইয়া অতি ধীর শান্তকণ্ঠে বলিল, চাবির আলনায় চাবি আছে, ঘরের নম্বর দেখে চাবি নিয়ে যাও।

দেখে এসেছি, কুড়ি নম্বর, বলিয়া নবীন চলিয়া গেল। সুমিত্রা কয়েকমুহূর্ত্ত নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিপথগা জাহ্নবীর যে বিপুল স্রোতোবেগ ঐরাবতের মত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সে স্রোত স্তব্ধ হইয়া গেছে, তাই অচল পদার্থের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য, তারপরই নিজেকে সংযত করিয়া বহির্ব্বাটির দিকে অগ্রসর হইল।

শিবশঙ্কর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া তাঁহার পত্রাদি দেখিতেছিলেন, সুমিত্রা কক্ষে প্রবেশ করিল। শিবশঙ্কর মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আলোক এসেছে।

আলোক কক্ষবিলম্বিত আলোকচিত্রগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, পিতার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সুমিত্রাকে দেখিল; নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিল। কিন্তু চরণ স্পর্শ করিল না।

আজ আর সুমিত্রা প্রগল্‌ভার মত আচরণ করিল না। অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে আশীর্ব্বাদ করিল। পিতা কালীঘাটের দৃশ্য দেখেন নাই, আলোকেরও তাহা মনে ছিল না, মনে থাকিবার কথাও নয়, তথাপি পিতাপুত্রের উভয়েরই মনে হইল, সম্বর্দ্ধনায় যে সুরটি বাজিবার কথা, তাহা বাজিল না।

পিতা কাগজপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন, পুত্র বিমাতার মুখের পানে না চাহিয়াই প্রশ্ন করিল, সমরেশ কৈ ?

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, কোথায়ও বেরিয়েছে বোধহয়, আসবে এখুনি। ঐ যে নাম করতে করতেই—সমর, তোমার দাদা এসেছেন।

সমরেশ ঘরে ঢুকিয়া দাদাকে প্রণাম করিতে আলোক বামহস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সুমিত্রা বলিল, সমর, দাদাকে ওপরে নিয়ে যাও।

চলুন দাদা, সমরেশ মুহূর্ত্তের জন্যও অপরিচয়ের দূরত্ব অনুভব করে নাই, একরূপ টানিতে টানিতেই আলোককে ভিতরের দিকে লইয়া গেল।

সুমিত্রা প্রসন্ন হাসিমুখে শিবশঙ্করের পানে চাহিতে শিবশঙ্করের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু বড় ম্লান হাসি। বিশুষ্ক বনানী, লতায়-পাতায় তৃণে মৃত্তিকায় সজীবতা শ্যামলতা কিছুই নাই—হাস্যে প্রাণ নাই। সুমিত্রাকে ইহা আঘাত করিল। একখানা কেদারায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি বুঝি আলোককে আনতে গেছলে ? তাই দেরী হলো বুঝি ? সেইকথাটা টেলিগ্রাফে বললেই পারতে। আমি ক'দিন আকাশ পাতাল কত কি ভেবে সারা হচ্ছি।

শিবশঙ্কর ম্লানমুখে বলিলেন, আমি ত ওকে আনতে যাই নি।

সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু শিবশঙ্কর আর কোন কথাই বলিলেন না। তখন আবার প্রশ্ন করিতে হইল, ওরাও বুঝি সদরে মোকর্দ্দমা করতে এসেছিল—সেইখানেই তোমার সঙ্গে ওর দেখা হল বুঝি?

শিবশঙ্কর বলিলেন, আমি নন্দীগাঁ গেছলুম।

নন্দীগ্রামে অলকের শ্বশুরবাড়ী।

স্বামীর এইরূপ এলোমেলো ও খাপছাড়া কথায় সুমিত্রা চটিয়া উঠিয়া বলিল, আমিও ত তাই বলছি। কথা সোজা করে বললে দোষটা কি হয় তা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো তুমি?

শিবশঙ্কর বেত্রাহত কুকুরের মতো, মলিন দুইটি চক্ষু তুলিয়া অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, আমি আনতে যাই নি সেই কথাই বলেছি, আর ত কিছু বলি নি।

সুমিত্রা বলিল, গেলেই বা! নিজের ছেলেকে বাড়ী আনতে যাওয়াটা দোষের, না,. নিন্দের, তাই শুনি?

শিবশঙ্কর কি যেন বলিতে গেলেন, বারকতক ঠোঁট দু'খানা কাঁপিয়াও উঠিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া হাতের চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন।

সুমিত্রা দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার চোখ দু'টায় যেন আগুন ধরিয়া গেল, তীব্রকণ্ঠে কহিল, আলোক বাড়ী এসেছে ব'লে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি এই যদি তুমি ভেবে থাকো, মস্ত ভুল করেছ!—বলিয়াই বাহির হইয়া গেল। শিবশঙ্কর ব্যথাভরা দু'টি চক্ষু তুলিয়া চশমার ভিতর হইতে একবার সেদিকটা চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কিন্তু একটা কথা বলিবার কিম্বা একবার ফিরিয়া ডাকিবার চেষ্টাও করিলেন না। কিন্তু সুমিত্রা আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, শুনছি এই পাশের ঘরটায় নাকি ওর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে?

শিবশঙ্কর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সুমিত্রা আবার বলিল, বাড়ীর কর্ত্তা বাইরে থাকবেন, বাড়ীর বড় ছেলে—সর্বস্বধন—সে'ও বাইরে থাকবে, আর আমরা পড়ে থাকবো অন্দরমহলের এক কোণে, এই যদি পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়, তাহলে খুলে বলো না কেন, আমি আমার ছেলেটাকে নিয়ে যেখানে খুসী চলে যাই।

শিবশঙ্কর নীরব। সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি ক্রোধে অন্ধ না থাকিলে দেখিতে পাইত, লোকটা যেন পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তাহা দেখিল

না, বুঝিল না। নিজের ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল, বিয়ের পর এ বাড়ীতে পা দিয়েই শুনলুম, বোন্ এসে ভাইকে নিয়ে গেছে, বাপ জানেও না; আজ যদি বা বোন্ দয়া করে ভাইকে বাপের সঙ্গে পাঠালে, বাপ তাকে আগলে রাখছেন, পাছে বিমাতা রাক্ষসী তা'কে—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সুমিত্রা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

বহুক্ষণ পরে সে যখন উপরে তাহার মহলে প্রবেশ করিল তখন দুই ভাই অসংযোগে বসিয়াছে। সমর অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, আলোক গম্ভীরভাবে দু'একটি কথা বলিতেছে, অথবা হাঁ না কিম্বা শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছে মাত্র। সমরেশ মাকে দেখিবামাত্র বলিল, আমরা রোজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার কথা বলাবলি করতুম না মা?

সুমিত্রা কথা কহিল না, ঈষৎ হাসিল।

সমরেশ বলিল, সেবার ন'মামার বিয়েতে কলকাতায় গিয়ে, তুমি নিজে মেডিকেল কলেজে দাদার কত খোঁজ করলে, না মা?

আলোক বিস্মিত চোখে বারেকমাত্র বিমাতার পানে চাহিয়া বলিল, তাই নাকি?

এবারও সুমিত্রা কথা কহিল না, হাসিল।

সমরেশ বলিতে লাগিল, আমি যত বলি, মা, তুমি ত দাদাকে এতটুকুন বেলায় একটি দিন মাত্র দেখেছ, চিনবে কি করে—মা তত বলে, তোর অত ভাবনায় দরকার কি, তুই আমায় নিয়ে চল্ ত, তারপর চিনতে পারি কিনা—দেখিস্।

আলোক বলিল, কবে বল তো?

সমরেশ বলিল, গতবছর মে মাসে।

আলোক মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল,এপ্রিল মে দু'মাস আমরা কলকাতায় ছিলুম না, দিদিকে নিয়ে আলমোড়ায় ছিলুম।

সুমিত্রা বলিল, আলমোড়ায় কেন?

আলোক মলিনমুখে কহিল, দিদির অসুখটা তখনই জানা গেল কিনা। আলমোড়া থেকে হলদৌনি, সেখান থেকে মাদ্রাজে মদনপল্লী, মণ্ডপম্, তারপর যাদবপুর—ঘুরে ঘুরে এই মাসখানেক ত দিদি ফিরেছিলেন মোটে।

সুমিত্রা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল, তারপর? এখন—কেমন—

আলোক ব্যথিত সজলকণ্ঠে কহিল, এই শুক্রবারে সব শেষ!

সুমিত্রা স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুক্রবারে শিবশঙ্কর সদরে যান, সেই রাত্রে টেলিগ্রাফ আসে, অভাবনীয় কারণে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

সুমিত্রা ভয়ে ভয়ে আলোকের পানে চাহিয়া রহিল।

আলোক বলিল, আদালতে জামাইবাবুর এক বন্ধুর কাছে বাড়াবাড়ির খবর পেয়েই বাবা নন্দীগাঁ যান্; কিন্তু দিদিকে দেখতে পান্ নি। আর আধঘণ্টা আগেও যদি যেতেন, শেষ দেখাটা হোত। আলোক এক মুহূর্ত্ত থামিয়া রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠে বলিল, দিদি শেষ দু'দিন কেবল বাবার নাম করেছে। তার ছেলেমেয়ের কথা নয়, জামাইবাবুর কথা নয়, কেবল বাবা বাবা করেছে, আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল কি-না, কাঁদতেও কষ্ট হোত! ঠোঁট দু'টি যখনই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তো, আমরা কান পেতে শুনতুম, বাবা বাবা করছে। আর দু'টি চোখে শতধারা।

আলোক থামিল, একটু পরে আবার বলিল, দিদির শেষ কথা, বাবা ক্ষমা করো।

থালায় অভুক্ত আহার্য্য যেমন পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল, আলোক আপনাকে আর সামলাইতে না পারিয়া উঠিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। সুমিত্রা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিল; তারপর উঠিয়া গিয়া আলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, কিছুই ত খাও নি, যেমন খাবার তেমনই পড়ে আছে, খাবে চলো।

আলোক ত্রস্তে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর খাব না। সুমিত্রা আর পীড়াপীড়ি করিল না। পীড়াপীড়ি করিবার মতো মনের অবস্থা তাহারও ছিল না। তাহার মনের পটে বাহিরের ঘরে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটা ফুটিয়া উঠিয়া শত বৃশ্চিক দংশন জ্বালায় অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই যে মানুষটা হিমালয়ের মত সমস্ত আঘাত নীরবে সহ্য করিল, তাহার ভিতরকার অগ্ন্যুত্তাপ, মর্ম্মভেদী হাহাকার ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিল না, তাহার কথা ভাবিতে গিয়া সুমিত্রা আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে কাছে যাইতে আলোক অশুচিভয়ে ভীত ব্যক্তির মতো যেভাবে সরিয়া গিয়াছিল, নারীর অন্তরে সে আঘাত নিতান্ত অল্প ছিল না, কিন্তু ইহাও তাহার চিত্তে আসন পায় নাই। সুমিত্রা কেবলই ভাবিতেছিল, লোকটা

কি সত্য সত্যই নীলকণ্ঠ নহে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গরল, সমস্ত হলাহল, সমস্ত আঘাত নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিয়াও এমন স্থির, এমন ধীর, এমন শান্ত, নীলকণ্ঠ মহাদেব ভিন্ন আর কে থাকিতে পারে? সুমিত্রার সামনে একটা নিঃশ্বাসও ত সে ফেলে নাই। সুমিত্রার বুকের ভিতরটা যেন ছেঁচিয়া থাইতেছিল। "মা গো" বলিয়া একটা চীৎকার করিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যাইত।

সেই রাত্রে, ছেলেরা ঘুমাইলে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নীচে নামিয়া শিবশঙ্করের শয্যায় ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। শিবশঙ্কর জাগিয়াই ছিলেন, বলিলেন, কিছু বলবে?

সুমিত্রা বলিল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথা কেন?

সুমিত্রা সে কথার উত্তর দিল না, পুনশ্চ বলিল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

শিবশঙ্কর বলিলেন, মুখে না বললে বুঝি ক্ষমা করা হয় না? তুমি ক্ষমা চাইবে, তবে আমি ক্ষমা করবো? আর কিসের জন্যে ক্ষমা বল ত! আমি কি কোনও দিন তোমার ওপর রাগ করেছি যে, ক্ষমা চাইতে হবে? এ কি তুমি নিজেও জান না?

সুমিত্রা কাঁদিয়া উঠিল : বলিল, ওগো, সেই জন্যেই ত তোমার পা ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছি। জানি তুমি রাগ কর না, তবু ক্ষমা চাই, আমার শত সহস্র অপরাধ চিরকালই তুমি ক্ষমা কর। তবু একটিবার মুখ ফুটে বল, ক্ষমা করলে!

শিবশঙ্কর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, শুনলে সুখী হও? বেশ বলছি, ক্ষমা করলুম।

এ কথার পর সুমিত্রা যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীর দুইটি পায়ের মাঝখানে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিবশঙ্কর কোন কথা বলিলেন না, নিবৃত্ত অথবা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টাও করিলেন না। বহুক্ষণ এইরূপে উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে, শিবশঙ্কর বলিলেন, রাত হয়েছে, শোওগে।

সুমিত্রা সাড়াও দিল না, উঠিলও না, তেমনই পড়িয়া রহিল। এইবার শিবশঙ্কর উঠিয়া বসিলেন। চরণোপান্তোপবিষ্ট স্ত্রীর মাথাটি দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন। সুমিত্রা দক্ষিণ হস্তে তাঁহার গলবেষ্টন করিয়া কাঁধের উপর মাথা রাখিল—লতাটি সহকার অঙ্গে আশ্রয় লভিল। স্বল্পালোকিত কক্ষ যেন উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া গেল।

ঘড়িতে দু'টা বাজিল। সুমিত্রা উঠিয়া বসিল, দেখিল, শিবশঙ্কর সতৃষ্ণনয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। দেড় যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে—যুগ ত নয়, যেন দীর্ঘ শত বৎসরের দারুণ মন্বন্তর গিয়াছে—শিবশঙ্করের নয়নে এ দৃষ্টি সুমিত্রা দেখে নাই। এই দৃষ্টি যেন বহুদূর উত্তীর্ণ অতীতকালের মধ্যে, একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অতৃপ্ত-যৌবন বারিধির মাঝখানে নিয়া গিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। হায়! আকাশে নববরষার ঘনঘটা, চাতকী উপেক্ষা করে কেমন করিয়া? তাহার বুকও যে তৃষ্ণায় মরুভূমি হইয়া আছে। সোহাগে, স্নেহে, আদরে স্বামীর অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুমিত্রা বলিল, আমাকে কিছু বলবে?

শিবশঙ্কর ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে গোপন করিয়া বলিল, কি বলবো?

তৃষিতা চাতকী কহিল, যা-হোক্ কিছু বলো। আবার তাহার গলা কাঁপিয়া গেল; চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। সুমিত্রা নয়ন গোপন করিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন, বলবো?

বলো, বলিতে বলিতে সুমিত্রা সাগ্রহে, ব্যাকুল দু'টি আর্ত্ত বুভুক্ষু চক্ষু তুলিয়া মেঘের পানে চাহিল। বড় আশা, বারিদ বিফলে যাইবে না, বৃষ্টি হইবেই, তাই একেবারে মেঘের সামনে—বড় কাছে, একেবারে অধরে অধরে—চাতকী তাহার অধরোষ্ঠ পাতিয়া রহিল। আমি কবি নহি, যদি কবি হইতাম, তবে সে সময়কার সেই রমণীয় দৃশ্য কাব্যে বর্ণনা করিতাম। পৃথিবী যেন অবলুপ্ত, সংসার কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া নারী তাহার সর্ব্বস্বের নিকট সর্ব্বস্ব কামনা করিতেছে। ধরণী সুপ্তিমগ্না, নিঃশব্দ কক্ষ, তাহারই মাঝে সুপ্তিহীন জগৎ জাগ্রতচঞ্চল মুখর হইয়া পরস্পরের পানে চাহিয়া আছে। আমি চিত্রকর নহি, যদি চিত্রকর হইতাম, তবেই এ ছবি আঁকিতে পারিতাম! দুঃখের বিষয় আমি চিত্রকর নহি। তা না হইতে পারি, কিন্তু চিত্র-বিচারে অক্ষম নহি। মনে হয় এমনই দৃশ্য যেন কবে কোথায়

যাও

দেখিয়াছি! কোথায়, ঠিক মনে নাই। যমুনা পুলিনে কি? সেই যে এক চিরকিশোর ধীর সমীরে যমুনার তীরে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, আর তাহার মুখের পানে চাহিয়া নবদূর্ব্বাদলশয্যায় শুইয়া একটি কিশোরী সেই বেণু শুনিয়া আত্মচেতন হারাইয়া পড়িয়া থাকিত, সেই কি? কে জানে, হইতেও পারে! কিন্তু ইহারা ত কিশোর কিশোরী নয়। নাই বা হইল, কি বা আসে যায়? যেখানে প্রেম, সেইখানেই চিরকৈশোর! যে ভাষায় সেই চাহনির উত্তর দিতে হয়, বৃদ্ধ হইলেও শিবশঙ্করের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সুমিত্রা বুকের উপর মাথাটি রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পড়িয়া রহিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, কৈ বললে না? শিবশঙ্কর আবার বলিলেন, বলবো?

সুমিত্রা সোহাগে গলিয়া বলিল, বলো। কিন্তু, ক্ষণবিলম্বও তাহার সহ্য হইতেছিল না; বুঝি বিলম্বে আর শোনা হইবে না। তাই আবার বুকের পরে ঢলিয়া পড়িয়া যেন কাঁদিয়া উঠিল, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি বলো না গো!

শিবশঙ্কর স্মিতমুখে কহিলেন, আমার আলোককে তুমি নাও। বড় দুঃখী ও, তুমি তাকে নাও।

নিলুম, বলিয়া সুমিত্রা স্বামীব পায়ের কাছে মাথা রাখিল; তারপর ধূলিশূন্য চরণদ্বয় হইতে পবিত্র পদরেণু আহরণ করিয়া মাথায় দিয়া সীমন্তিনী ধীরে কিন্তু দৃঢ় পদভরে কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন ভোরের পাখী প্রভাত-সঙ্গীত সুরু করিয়া দিয়াছে।

ছায়া

কিন্তু আলোককে লইয়া সুমিত্রাকে যে এতটা মুস্কিলে পড়িতে হইবে সে তাহা কল্পনাও করে নাই। মানুষ যে মানুষ হইতে এমন পৃথক, এতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে ইহা ভাবিতেও পারা যায় না। সুমিত্রা তাহাকে বিষয় আসয় বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, উত্তর পাইয়াছিল—ওসব তাহার আসে না। সমরেশটা চিরকগ্ন, একটা না একটা রোগ লাগিয়াই আছে, তাহার চিকিৎসা

ভারটাও সে লইল না, বলিল, পাশ করিয়া বাহির হইলেই যদি ডাক্তার হওয়া যাইত, তাহা হইলে বাঙলা দেশের পাঁচ হাজার ছেলে কোন্ কালে বিধান রায়ের অন্ন মারিয়া দিত। সুমিত্রা কোন দেশ দেখে নাই, কোন তীর্থ ভ্রমণ করে নাই, তাহার ইচ্ছা সমরেশের কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি হইলে আলোক তাহাদের লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারত দেখাইয়া আনে। শিবশঙ্কর প্রস্তাব শুনিয়া উল্লসিত হইলেন; কিন্তু আলোকের মত হইল না। তাহার এখন সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। সময় এত মূল্যবান কিসে, তাহাও বুঝা দায়। কাজের মধ্যে ত বহুবার অধীত ডাক্তারী বইগুলি। ঐগুলার সাহায্যেই পাশ করা গিয়াছে, আবার ওগুলা নাড়াচাড়ার কি অর্থ হইতে পারে? পাশ করার পর কোন্ ছেলে আবার সেই পুরান বই মুখস্ত করে!

সমরেশের গ্রীষ্মের ছুটি হইল। বাপ-মায়ের নির্দ্দেশে সে একজন সরকার ও একটি চাকর লইয়া দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গেল। তাহার ছোটমামা দার্জ্জিলিঙে ঠিকাদারী কাজ করেন, নিজস্ব বাড়ী আছে, সমরেশ সেইখানেই থাকিবে।

সুমিত্রা আলোকের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তুমিও দিনকতক ঘুরে এসো না কেন? যে গরম পড়েছে—

গরমে আমার কষ্ট হয় না—বলিয়া মেটিরিয়া মেডিকাখানা খুলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিল।

সুমিত্রা ইহা লক্ষ্য করিল; তবু ধীরস্বরে বলিল, গরমের সময় ঠাণ্ডা দেশে গেলে শরীরটা ভাল থাকে।

আলোক বলিল, ফিরে এসে গরমে আরও বেশী কষ্ট হয়। আর আমার শরীরটা চিরদিন ভালই থাকে, কখনও খারাপ হয় না—বলিয়া সগর্ব্বনেত্রে একবার নীরোগ বলিষ্ঠ দেহটা দেখিয়া লইল।

সুমিত্রা বলিল, ওঁর বড় ইচ্ছে ছিল আমিও সঙ্গে যাই—কথাটা শেষ হইতে না দিয়াই আলোক বলিল, তা যান্ না। সুমিত্রা উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, তুমি গেলে—

আমার যাওয়া অসম্ভব।

সুমিত্রা তাহার কথা কানে না তুলিয়াই বলিতে লাগিল, তুমি গেলে না, উনিও যাবেন না, তোমাদের ফেলে আমি যাই কেমন করে বলো? নইলে ঐ রোগা

অলবড্ডে ছেলেকে আমি কি একলা একলা ছেড়ে দিই! ওর মামা ঠিকেদারী করে, দিনে খেতে বাড়ী আসবার সময়ও পায় না, তার ওপর ওর ছোটমামা বিয়ে করে নি, বাড়ীতে মেয়েছেলেও কেউ নেই, কি যে করবে একা একা—

আলোক বলিল, আপনার যাওয়া উচিত।

সুমিত্রা কিছু বলিল না। আলোকের পুস্তকনিবদ্ধ মুখের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

আলোক একবার মুখটা তুলিয়া বলিল, বাবার জন্যে আপনি একটুও ভাববেন না, আমি ত রইলুম! আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।

সুমিত্রা কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আলোক মুহূর্তের জন্য মাথা তুলিয়া স্বচ্ছন্দগতি নারীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, যেন স্বচ্ছন্দ হইয়া কেদারাটায় হেলান দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হিন্দু সমাজের বিধানে এই নারী তাহার জননী, কিন্তু কেন যে কাছে আসিবামাত্র সে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া পড়িত, ইহা তাহার নিজের কাছেই কম দুর্বোধ্য ছিল না। সমরেশের জননী হইলেও, নিরুপম সৌষ্ঠবশালিনী সুমিত্রাকে বয়সের চেয়ে অনেক কম দেখাইত। চিত্রে, পটে যে মাতৃমূর্তি আমরা দেখি, সুমিত্রায় তাহারই পূর্ণাভিব্যক্তি দেখিয়াও কেন যে আলোকের মন সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে, যৌবনের বিপক্ষে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিত, তাহার হদিশ সে কিছুতেই পাইত না। ইহা তাহার বিকৃত মন ও রুচির পরিচয় এই ভাবিয়া নিজের উপর ক্রোধ না হইত এমন নয়। আজও একবার রাগ হইল, তারপর নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে ভুলিয়া গিয়া উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই আলোক তাহার পুস্তকে মগ্ন হইল। শুধু পুস্তক নয়, ইদানীং সে আর একটা কাজ সুরু করিয়া দিয়াছিল। কতকগুলা খরগোস্, গিনিপিগ্, বানর ও ওষুধ পিচকারী প্রভৃতি লইয়া কি যেন কি করিতেছে। বাগানের ধারে একটা ঘরে তাহার কারবার চলে। এমনও এক এক দিন হয় সেইখানেই তাহার খাবার পাঠাইতে হয়। প্রথম দিন, এ বাড়ীতে আসিয়া বাহিরের একটা ঘর সে-ই চাহিয়াছিল। কিন্তু পরে বুঝিল, পিতার শয়নকক্ষের পার্শ্বে এ সব কাজ না করাই ভাল। বাগানের দিকে অনেকগুলা ঘর পড়িয়াছিল, সেইগুলা সাফসুতরা করাইয়া সে নিজের 'কাজ' করিতেছিল। রাত্রে কোনদিন আসিত, কোনদিন তাহার ল্যাবরেটারীতে

ক্যাম্প খাটে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিত। একদিন অপরাহ্নে তাহার শুইবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল, সুমিত্রাকে তাহার জল খাবার লইয়া আসিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, আপনি দার্জ্জিলিং যান্ নি? সুমিত্রা মৃদু হাসিল, কথা কহিল না।

আলোক বলিল, যাওয়া কিন্তু উচিত ছিল, যে রোগা ছেলেটি আপনার!

সুমিত্রা জলখাবার সাজাইয়া রাখিতে লাগিল, কথা কহিল না।

আমি বলি কি, বাবা যদি যেতে চান, ওঁকেও দিন কতক নিয়ে যা ন্ না। বাবারও শরীরটা ত ইদানীং ভাল যাচ্ছে না, তার ওপর দিদির শোকটা কিছুতেই তিনি সামলে উঠতে পারছেন না।

খবর রাখ?—সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল।

চাবুক খাইয়া তেজস্বী আরবি ঘোড়া যেমন ঘাড় ঝাড়া দিয়া উঠে, আলোক সেইভাবে গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিয়া উঠিল, রাখি নে?—বলিয়াই থামিয়া গেল, আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা আমিই আজ বাবাকে বলবো'খন। সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া বলিল, তা বলো।—বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, তোমার বাবা যে তোমার বিয়ের কথা বলছিলেন।

বিয়ের কথা!—আলোক চমকিয়া উঠিল।

হঁা।

হঠাৎ?

হঠাৎ কি আবার! ছেলে বড় হয়েছে, কৃতী হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে না? ওঁর ইচ্ছে এই সামনের আষাঢ় শ্রাবণেই—সুমিত্রা হাসিয়া কহিতে লাগিল।

আলোক ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, ও কথা যাক্।

সুমিত্রা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এখানে কোন মতেই ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য হারাইবে না। পূর্ব্বের মতই হাসিমুখে কহিল, তুমি ত বললে থাক্, বাপ মা'র মন তা শুনবে কেন?

আলোক সংক্ষেপে কহিল, আমি বাবাকে বলবো।

সুমিত্রা কি যেন বলিতে চাহিল, কি-যেন ভাবিল, না বলাই সঙ্গত বিবেচনা করিল, আবার কি ভাবিল, বলিল, তিনি পুরুষমানুষ, যা-তা বলে তাঁকে না-হয় বোঝালে, আমাকে বোঝাবে কি বলে?

আলোক কোন দিকে না চাহিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল, ওসব কথা থাক্। —হঠাৎ ঘড়িব দিকে চাহিয়া ত্রস্তে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, চললুম, আমাব কাজ আছে।—বলিয়াই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সুমিত্রা তাহাব আগে দ্বাবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি যে এক ঘণ্টার ওপরে এগুলো নিযে দাঁড়িযে আছি, সেটা বুঝি দেখতেই পেলে না।

নিমেষমাত্র ছোট টেবিলটাব পানে দেখিয়া লইযা আলোক বলিল, বাগানে পাঠিযে দেবেন।—বলিযা বাহির হইযা গেল। সুমিত্রাব মুখ ছাই হইযা গেল। যে পথে আলোক গেল, সেই পথেব দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাব সুন্দব সুকুমাব সুকোমল মুখেব ভাবও ক্রমশঃ কঠোব হইযা উঠিল। তাবপর একটা চাকব ডাকিযা খাবাবটা বাগানে পাঠাইযা দিয়া নিজেব কাজে চলিয়া গেল। কিন্তু কাজ, কতটুকু কাজই বা আছে সংসাবে? স্বামীব কাজ নাই বলিলেও হয। যতটুকু আছে, বাহিববাটীব খানসামা চাকবেই কবে। সমরেশেব কাজ কিছু কিছু ছিল, তাহাও যৎসামান্য, এখন আবাব সেও গৃহে নাই। আপনাকে আলোকেব কাজে লাগাইবাব জন্য কত ছল, কত কৌশলই সে কবিযাছে, সবই ব্যর্থ হইযাছে। তাহাব ঘবটার চর্য্যা নিজেব হাতে কবিবাব জন্য বহু যত্ন কবিযাছে কিন্তু আলোক ঘবে চাবি দিয়া যায, সে পথটিও থাকে না।

বহির্বাটীতে আসিয়া দেখিল, শিবশঙ্কব চোখে চশমা আঁটিযা বিষ্ণুপুবাণ পাঠ করিতেছেন, অসমযে সুমিত্রাকে বাহিরে আসিতে দেখিযা বিস্মিত হইয়া বই বন্ধ কবিযা, চোখ হইতে চশমা খুলিযা, জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন।

সুমিত্রা যতখানি সম্ভব শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল, বাগানেব ঘরে সমস্ত দিন বাত ও কি কবে বল ত?

শিবশঙ্কর হাসিযা কহিলেন, ডাক্তারী গবেষণা টবেষণা করে বোধ হয।

মড়ার হাড় ফাড় আনে না ত?

শিবশঙ্কব হাসিযা বলিলেন, আশ্চর্য্য নয়। মড়া, মড়াব মাথা, নর-কঙ্কাল এ সবই ত ওদের মুড়ী মুড়কী।

সুমিত্রা বলিল, না, না, ওসব বাড়ীতে না আনে, বাবণ করে দিযে।

তুমিই বলে দিও—শিবশঙ্কর হাসিলেন।

তুমি না পারলে, আমাকেই বাবণ কবতে হবে—কথাটা বলিয়া ফেলিযাই

মনে হইল, বড় রূঢ় হইয়া গেছে। নিজের কানেই যাহা রূঢ় ঠেকিল, অন্যের কানে যে আরো বহুগুণ কর্কশ ঠেকিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই লজ্জিতভাবে বলিল, সমরার ইচ্ছে, দাদার মত ডাক্তারী পড়ে! মূর্খ হয়ে বসে থাকে, সেও ভাল, মড়ার হাড কাটা বিদ্যেয় দরকার নেই। শিবশঙ্কর হাসিয়া চশমা জোড়া তুলিয়া পার্শ্ব-রক্ষিত রুমাল দিয়া কাচ দু'খানা মুছিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা বলিল, যত অনাছিষ্টি কাণ্ড সব। বাড়ীর মধ্যে আবার হাড়গোড় আনা। না, না, হাসছ কি, বারণ করতেই হবে। কিন্তু বাবুর দেখা পাওয়াই ত ভার, বারণ করি কখন্?

কেন? খেতে আসে না?

অর্দ্ধেকদিন বাগানে খাবার পাঠাতে হুকুম পাঠায়। তোমার কাছেও আসে না বোধ হয়?

শিবশঙ্কর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, দিনের বেলা বড় দেখি নে, রাত্রে রোজ একবার ক'রে খোঁজ নিয়ে যায়।

আজই বিকালবেলায় আলোকের চমকের হেতু বুঝিয়া, অন্যমনস্কের মত সুমিত্রা কহিল, এলে একবার আমার কাছে যেতে বলো।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক কক্ষে প্রবেশ করিল। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া শিবশঙ্কর প্রশান্ত হাস্য-মুখে কহিলেন, মড়ার হাড়ের কথাটা এই বেলা·বলে দাও না!

হঠাৎ সুমিত্রাকে যেন সেই আগেকার ভূতে পাইয়া বসিল। অকস্মাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, আমি কেন, বলতে হয় তুমিই বলো—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আলোক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, আমি কলকাতায় একটা ডিসপেন্সারী ও একটা ক্লিনিক করবো মনে করছি।

শিবশঙ্কর বলিলেন, বেশ ত!

আলোক বলিল, কলকাতাতেই থাকতে হবে।

এখান থেকে যাওয়া আসা চলবে না?

না, তাতে কাজের অসুবিধে হবে।

অসুবিধে হলে কলকাতাতেই বাসা করতে হবে বৈকি।

আলোক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, আমার কিছু টাকার দরকার।

শিবশঙ্কর বলিলেন, ওঁকে বলো।

আলোক পিতার পানে চাহিল, তিনি বিষ্ণুপুরাণে চক্ষুনিবদ্ধ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া আলোক এটা ওটা নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিল,—হাজার দশ বারো—

শিবশঙ্কর বলিলেন, উনিই দেবেন।

শিবশঙ্কর পাতা উল্টাইয়া এ পাতার শেষের সহিত ওপাতার প্রথমটা মিলাইয়া লইয়া বলিলেন, বললেই চেক লিখে দেবেন।

আলোক উঠিল। বাগানের দিকেই যাইতেছিল, গেল না, অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তিত মুখে ফিরিয়া অন্তঃপুরের দিকে গেল। শুনিল, গৃহিণী স্নান-কক্ষে। শুনিয়া যেন তখনকার মত বাচিয়া গিয়াছে ভাবিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

সুমিত্রা স্নান সারিয়া বাহিরে আসিলে, পিসী বলিলেন, তোমার কি ভাগ্যি বউ, কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলে, মা। বড়বাবু যে তোমার খোঁজে বাড়ীর মধ্যে এসেছিলেন গো।

এই শ্লেষ বিদ্রূপের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, একটু বস্‌তে বললে না কেন। যাই—বাগানেই গেছে বোধ করি—দেখি, কি বলে!

আলোক বাগানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। মনের মধ্যে একটা দারুণ বিরুদ্ধতা মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাহার দিদির কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়িয়া গেল। যখনই বাবার কথা উঠিত, দিদি বলিত, আমাদের বাবা কি আর আমাদের আছেন আলোক? আমাদের মা'র সঙ্গে বাবাকেও আমরা হারিয়েছি। কথাগুলা যে এমন কঠোর সত্য, আজিকার আগে একটি-বারও আলোকের তাহা মনে হয় নাই। পিতার এইরূপ অসহায় অবস্থা তাহার বিরুদ্ধচিত্তে শান্তিবারি বর্ষণ করিল না ইহা বলাই বাহুল্য। ঘৃণামিশ্রিত করুণায় তাহার মন ভরিয়া গেল এবং পিতাকে যে লোক এইরূপ অসহায় অমানুষ করিয়া রাখিয়াছে, এইমাত্র সে-যে তাহারই কাছে হাত পাতিতে গিয়াছিল ইহা মনে পড়িতেই নিজের উপর একটা ধিক্কার জন্মিল। সাধারণতঃ বাগানের ঘরগুলায়

যে সকল কার্য্য সে করিত, আজ ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিল, তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টাই বৃথা। ঘর বন্ধ করিয়া আলোক সাইকেলে চড়িয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা তাহাকে বাগানে না দেখিয়া ভাবিল, আলোক তাহার পিতার কাছে গিয়া থাকিতে পারে। সেখানে আসিয়া দেখিল, শিবশঙ্কর তখনও নিবিষ্টচিত্তে পুরাণ পাঠ করিতেছেন। সুমিত্রাকে দেখিয়া তিনি কেতাব বন্ধ করিলেন। সুমিত্রা বলিল, আলোক এসেছিল না এখানে ?

হ্যাঁ! তারপর সে ত তোমার সন্ধানেই গেল!

শুনলুম বটে; কিন্তু তারপর থেকেই কোথায়ও নেই! বাগানেও দেখলুম ঘর বন্ধ।

শিবশঙ্কর বলিলেন, বাইরে গেছে বোধ হয়, আসবে'খন।

সুমিত্রা আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

পরদিন বেলা বোধ করি ১২টা কি ১টা হইবে, আলোক পিতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমাকে এখনই কলকাতা যেতে হচ্ছে। জয়দ্রথ সেন—আমরা একসঙ্গে ফাইন্যাল এম্-বি পাশ করেছিলুম—টেলিগ্রাম করেছে এখনি যেতে হবে।

শিবশঙ্কর বলিলেন, এখন কি কোন ট্রেণ আছে ?

আছে, দেড়টায়। সেইটাই ধরবো।

কবে ফিরবে ?

তা এখন কি করে বলবো ? দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরতে পারবো বলে মনে হয়।

সে উঠিতে উদ্যত হইয়াছিল, শিবশঙ্কর বলিলেন, তোমার মা'র সঙ্গে কাল কথা হয়েছিল ?

আলোক পিতার পানে না চাহিয়াই কহিল, না।

শিবশঙ্কর চিন্তাযুক্তস্বরে কহিলেন, এখন বোধহয় বাড়ী নেই, মণিবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন গেছেন, ফিরতে হয় ত সন্ধ্যা হবে।

আলোক যেমন নীরবে বসিয়াছিল, তেমনই রহিল। শিবশঙ্কর চশমার ফাঁকে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কাল গেলে হয় না ?

আলোক বলিল, কেন ?

শিবশঙ্কর কতকটা সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, টাকাটা তা'হলে নিয়ে যেতে পারতে।

আলোক এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তারপর বলিল, টাকা নেবার আমার ইচ্ছে নেই—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইয়া যাইতেছিল, থামিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া পিতার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল। শিবশঙ্কর পুত্রের দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আলোক অদৃশ্য হইলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া পাঠে মন দিতে গিয়া দেখিলেন, মুহূর্ত্তে চোখের দৃষ্টি লোপ পাইয়াছে, একটি অক্ষরও আর দেখা যায় না।

একটু পরে মোটর আসিয়া থামিলে জুতার শব্দ উত্থিত হইল, মোটর ষ্টার্ট লইয়া বাহির হইয়া গেল, শিবশঙ্কর সেইখানে স্থাণুব মত বসিয়া বসিয়া সবই শুনিলেন, সবই জানিলেন, মোটবে কে গেল, তাহাও অজ্ঞাত রহিল না। অন্তরের ভিতরে যে অন্তর, হৃদয়ের মণিকোঠায় যাহার অধিষ্ঠান, সেই বারম্বার কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু শিবশঙ্কর সেই যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অনড় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

রাত্রে নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে ফিরিয়া সুমিত্রা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আলোক এমন হঠাৎ চলে গেল যে!

শিবশঙ্কর যতটুকু জানিতেন, বলিলেন।

সুমিত্রার কৌতূহল সাধারণ স্ত্রীলোকের অপেক্ষা কম কি না জানি না, কিন্তু কৌতূহল দমন করিবার শক্তি ছিল তাহার অসামান্য। আজ প্রথম অনুভব করিল, সে শক্তি তাহার লয় পাইয়াছে। বলিল, আমাকে কাল সে অনেকবার খুঁজেছিল, কেন—বলতে পারো?

পারি।

সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন, ও কিছু টাকা চায়।

সুমিত্রা বলিল, কত টাকা?

দশ বারো হাজার?

অত টাকা নিয়ে কি করবে ?

শিবশঙ্কর বলিলেন, ডিস্‌পেন্সারী আর একটা ক্লিনিক করবে।

সুমিত্রা এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া বলিল, তা যা খুসী করুকগে, কিন্তু টাকাটা তুমিই দিয়ে দিলে না কেন ?

আমি কোথা পাব ? বলিয়া শিবশঙ্কর হাসিলেন।

সুমিত্রার চিত্ত সে হাসিতে প্রফুল্ল হইল না ; বলিল, তুমি কি বললে তাকে ?

তোমার কাছে চাইতে বললুম।

সুমিত্রা আর বিরক্তি গোপন করিতে পারিল না ; অত্যন্ত পৌরুষ ও তিক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমার মাথাটি কিনলে।

শিবশঙ্কর অকস্মাৎ উষ্মার হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিলেন।

সুমিত্রা পূর্ব্বের মত উগ্রকণ্ঠে কহিল, ভারী পৌরুষ জাহির হ'ল, না ? একে দেখছ আমার কাছে ধরা ছোঁয়াই দেয় না, সে যাবে আমার কাছে টাকার জন্তে হাত পাততে ? বললেই পারতে, টাকা ত ঘরে থাকে না, ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে দোব। ছিঃ ছিঃ কি ভাবলে সে মনে মনে !

শিবশঙ্কর নির্ব্বাক।

সুমিত্রা বলিতে লাগিল, তোমাকে যা ভাবলে, সে ত জানাই আছে, কিন্তু, ছিঃ ছিঃ আমাকেও—সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

শিবশঙ্কর বলিলেন, আহা, তাতে আর হয়েছে কি। দু'চারদিন বাদেই ত আসছে, তখন টাকাটা না হয় আমিই হাতে করে দেবো'খন।

এলে ত ! --কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই মনে মনে শতবার জিভ কাটিয়া, সামলাইয়া লইয়া কণ্ঠস্বরে যতখানি দৃঢ়তা আনা সম্ভব তাহাই আনিয়া বলিল, নিলে ত ! মন তবু শান্ত হয় না ; অনুশোচনা তবু ঘুচে না। রাগটা নিজের উপরই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া সব রাগ গিয়া পড়িল বেচারা শিবশঙ্করের উপর। একটা দাবদাহী দৃষ্টিতে বৃদ্ধের অবিকম্পিত দেহখানিকে আমূল আলোড়িত করিয়া সশব্দে বাহির হইয়া গেল। বিষ্ণুপুরাণ শিবশঙ্করের মগজ হইতে বহুকাল পূর্ব্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল।

পাঁচ

দিন পনেরো কুড়ি পরে আলোক ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়াই পিতার ঘরে ঢুকিল। এই ক'টাদিন শিবশঙ্করের অত্যন্ত উৎকণ্ঠাতেই কাটিয়াছে। যাহারা ভিতরের উৎকণ্ঠা বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেয় না, সর্ব্ব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যেই গোপন করিয়া রাখে, বাহিরের লোকে নাই বুঝুক, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। তুষের আগুন বাহিরে আসে কম, ভিতরেই গন্ গন্ করে। আলোক চরণ স্পর্শ করিতেই তাহার মাথাটা ধরিয়া বুকের কাছে খানিকটা টানিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এতটা ভাবাতিশয্য প্রকাশ, শিবশঙ্করের পক্ষে একেবারে নূতন।

আলোক বলিল, আমি একটা রয়াল কমিশন পেয়েছি।

বিষয়ী লোক, উকীল মোক্তাররাই কমিশন করে, শিবশঙ্কর তাহাই জানিতেন। বলিলেন, কমিশন? কিসের কমিশন? ডাক্তাররাও কমিশনারী করে নাকি?

আলোক মৃদু হাসিয়া কহিল, মেডিক্যাল কমিশন, যুদ্ধের কাজ।

শিবশঙ্কর চক্ষু কপালে তুলিয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে যাবে নাকি?

আলোক বলিল, না, ঠিক যুদ্ধে নয়, তবে সৈন্যদলের সঙ্গে যখন থাকতে হবে, যেতে না হতে পারে এমন নয়।

শিবশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কথাগুলা যেন মগজে ঘা মারিয়া সারা মস্তিষ্কটাকেই অসাড় করিয়া দিয়াছে।

আলোক বলিল, আমরা প্রায় সত্তর আশী জন এম্-বি যাচ্ছি। সকলে কমিশন পায় নি, আমরা তিনজন সিলেকসান্ পেয়েছি।

শিবশঙ্করের কানও বধির হইয়া গিয়াছিল, আলোক আরও কত কি বলিয়া গেল, তিনি তাহার একটি বিন্দুও শুনিতে পাইলেন না। শেষে আলোক যখন প্রস্থানোদ্যত হইয়াছে, তখন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমি বুড়ো হয়েছি, আর ক'দিনই বা বাঁচবো? যে ক'টা দিন আছি—

না, না, ভয় পাবার কিছু নেই এতে।—বলিয়া সে চলিয়া গেল। শিবশঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিলেন।

খবর চাপা থাকিবার নয়, থাকেও না, এক্ষেত্রেও রহিল না। অন্তঃপুরে পিসী আজ বহুকাল পরে আলোকের মাতার শোকে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আবাগীর বরাতকে বলিহারী যাই, একটা নিলে যক্ষ্মায়, যমে, আর একটা গেল যুদ্ধে।

খবর সুমিত্রাও শুনিয়াছিল। ধীরপদে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, সত্যি ?

শিবশঙ্কর ঘাড় নাড়িলেন। সত্য।

সুমিত্রা বলিল, বারণ করবে না ?

শিবশঙ্কর এবারেও ঘাড় নাড়িলেন, তবে অন্য দিকে।

সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বারণ করবে না, বল কি ? যুদ্ধ থেকে কেউ কি ফিরে আসে ?

শিবশঙ্কর নীরবে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ললাট নির্দ্দেশ করিলেন।

সুমিত্রা বলিল, না, না, ভাগ্যি টাগ্যি আমি জানি নে। তুমি বারণ করো; বলো, যেতে পাবে না।

শিবশঙ্কর শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, কথা থাকবে না, মিত্রা, কথা থাকবে না।

অন্য সময়ে, আদরের এই নাম শুনিলে বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠিত; এখন কানে গেল কি না, তাহাও বুঝা গেল না। বোধ হয়, শুনিতে পায় নাই।

সুমিত্রা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কে বললে থাকবে না ? নিশ্চয়ই থাকবে, ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে বল দিকি, কেমন না কথা থাকে ?

শিবশঙ্কর চুপ করিয়া রহিলেন। সুমিত্রা বলিল, বলবে ত ?

কথা থাকবে না জানি, তবুও বলাতে চাও, বলবো। কিন্তু কথা থাকবে না—থাকবে না—থাকবে না।

হঠাৎ সুমিত্রার দু'চোখে জল আসিয়া পড়িল। অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, কেন থাকবে না তা বলতে পারো ? সে কি আমার জন্যে ? আমি বিমাতা, তাই ? বিমাতার সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে হবে বলে যুদ্ধে যাওয়া ? এই ত! কিন্তু বিমাতা যদি ঘর ছেড়ে চলে যায়, তা'হলে—তা'হলে ত আর যুদ্ধে যেতে হবে না ?—বলিতে বলিতে সে চুপ করিল। আবার বাষ্পগদগদকণ্ঠে

কহিল, তাই কর না গো, দাও না আমাকে কোথায়ও পাঠিয়ে? তাই দাও, তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, বাহিরের চেয়ে ঘর অধিক অন্ধকার, ঘরে আলো নাই, তাই আরও অন্ধকার। তবুও শিবশঙ্কর হাত বাড়াইয়া সুমিত্রার একখানা হাত ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আস্তে কথা বলো, চারদিকে চাকর বাকর ঘুরছে, তারা কি মনে ভাববে?

সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিল, ভাবতে কি আর কারও কিছু বাকী আছে মনে করছ? যা ভাববার লোকে তাই ভাবছে। ভাবছে সৎমাই সতীনের ছেলেটিকে যমের দোরে ঠেলে দিলে! না না, পায়ে পড়ি তোমার, আমাকে কোথায়ও পাঠিয়ে দাও। পাঠিয়ে না দাও, দূর করে দাও। তুমিও অক্ষম নও, এই পৃথিবীও ছোট নয়, একটা স্ত্রীলোকের জন্যে যথেষ্ট ঠাঁই হবে।

মা!

সমরেশ মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই এদিকে আসিয়াছিল, কক্ষ নীরব ও নিষ্প্রদীপ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, শিবশঙ্কর ডাকিয়া বলিলেন, সমর, তোমার মাকে নিয়ে যাও তো!

কই মা? মা!

এই সময়ে ভৃত্য আলো লইয়া আসিল। সুমিত্রার হুঁশ ছিল না, থাকিলে উঠিয়া বসিত। ভৃত্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। সমর মায়ের পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, মা!

সন্তানের স্পর্শ, দেবদানবের যুদ্ধে মৃতসঞ্জীবনী সুরার মতো, সুমিত্রা মুখে কাপড় চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছেলেকে কাছে টানিয়া বলিল, চলো বাবা।

শিবশঙ্কর বলিলেন, রাত্রে ছেলেরা যেন আমার কাছে বসে খায়, বলে দিও।

রাত্রে কথাটা শিবশঙ্করই পাড়িলেন। যুদ্ধের বীভৎসতা, পাশবিকতা, হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিয়াই আসল কথা কহিলেন। শিবশঙ্কর বলিলেন, উনি বলছিলেন, তুমি যে সেই ক্লিনিক্ টিনিক করবে বলছিলে, সেই ত ভাল।

আলোক বলিল, হাঁ, সে ও ভাল।

শিবশঙ্কর কহিলেন, তবে তাই কেন কর না।

আলোক বলিল, এখন আর হয় না।

হয় না কেন ?

কমিশন নিযে ফেলেছি।

একমুহূর্ত্ত থামিযা কতকটা গর্ব্বদৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বাঙালী নির্বীর্য্য, বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ, বাঙালী যুদ্ধের নামেই ভয়ে আঁৎকে মরে যায়, এ সকল কলঙ্ক বাঙালীর আছেই, সেগুলো আরও বাড়ানো কোন বাঙালীরই উচিত নয়। কোথায় জাতির কলঙ্ক দূব কববো, তা নয়, আরও বাড়াবো ? আজ আমি পিছিযে গেলে কলেজের প্রিন্সিপাল ভাববেন—ভাববেন কেন, বলবেন—তুমি বাঙালী, সেই কালেই জানতুম, এই করবে! বাঙলার বাইরে যারা শুনবে তারাও বলবে, আরে বাঙালী ত এই রকমই করে। আজ যখন সুযোগ এসেছে, বাঙালী যুবকদের দেশের ও জাতির কলঙ্ক ঘুচোতেই হবে। বলিতে বলিতে তাহাব মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সুগৌরকান্তি স্বর্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইযা উঠিল।

শিবশঙ্কর পুত্রেব পানে চাহিযা নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কত কথাই বলিবার ছিল; এখনও আছে; কিন্তু এই উদ্দীপনার তেজে সমস্তই যেন নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছিল। কোন্ কথা বলিবেন অথবা কোন্ কথা বলিবেন না, ইহাই যেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। অশক্ত দেহ, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক, ধারণাশক্তিও অল্প, কথা মনে আসিলেও গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা অনেক সমযই থাকে না।

সমরেশও দাদার পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার ধমনীতেও শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন শিহরণ লাগিতেছিল। সমরেশের চোখে পলক ছিল না, একদৃষ্টে আলোকের বীর্য্যদীপ্ত আননের পানে চাহিয়া সেও যেন নিজ দেহে বীর্য্য অনুভব কবিতেছিল। আর একজন ছিল, সকলের অলক্ষ্যে বসিযা একমনে সেও কথাগুলা গ্রাস করিতেছিল। কক্ষ নিস্তব্ধ, খাওয়ার কথা কাহারও মনে নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়া আলোক হাসিয়া বলিল, পাঁচশ' হাজার বছর পরাধীনতা করার যা অব্যর্থ ফল, আমাদেরও তাই হয়েছে। যুদ্ধের নামেই আমাদের নাড়ী ছাড়ে; কেউ যুদ্ধে যাচ্ছে শুনলেই আমরা আগে ধরে নিই, সে মরে গেছে। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে যান্, দেখবেন, যুদ্ধের নামে তারা আনন্দ করে; যুদ্ধে যাবাব জন্যে রিক্রুটিং আফিসের দরজায়

হত্যা দেয়; আমাদেরও হয় ত একদিন সেদিন ছিল, কিন্তু সে বহু অতীতে। এখন যা দেখা যায়, তা ঠিক উল্টো। সমস্ত বাঙালী জাতটাই যেন শশকের প্রাণ নিয়ে জন্মেছে, কোনও মতে কোথায়ও মাথাটি গুঁজে বেঁচে থাকাটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একটিমাত্র আদর্শ। ভারতের আর কোন জাতের এতখানি অধঃপতন হয়নি, যেমন আমাদের হয়েছে—বলিয়া সে অভুক্ত আহার্য্য ফেলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। সমরেশও বিদ্যুতাকৃষ্টের মত তাহার অনুসরণ করিল।

শিবশঙ্কর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিয়া আরাম কেদারায় এলাইয়া পড়িলেন। সুমিত্রা ওদিকের দরজার সামনে যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। কতক্ষণ থাকিত কে জানে, ভৃত্য আহারের স্থান পরিষ্কার করিতে আসিয়া, থালাগুলিতে সজ্জিত আহার্য্য অস্পৃষ্ট দেখিয়া বলিল, মা, থালাগুলো কি নোব? সবই ত পড়ে আছে—

সুমিত্রা উঠিয়া আসিয়া থালা দু'খানা দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিয়ে যাও, আর কি খাবে ওরা? ভৃত্য চলিয়া গেলে অপরাধীর মত বলিল, খাবার সময় ওসব কথা না তুললেই হত, খাবার ছুঁলেও না, উঠে গেল।

শিবশঙ্কর কোন কথা কহিলেন না, চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, আকাশের কোন এক অলক্ষিত প্রান্ত হইতে কে যেন মধুর করুণ কণ্ঠে কাকুতি করিয়া বলিতেছে, ফেরাও, ওগো ফেরাও। স্বর বড় পরিচিত। হৃদয়াভ্যন্তরের প্রত্যেকটি তারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, যেন এক সুরে বাঁধা, এক তানে লয়ে গাঁথা! কাঁদিয়া বলিতেছে-- ফেরাও, ওগো ফেরাও।

কেমন করে ফেরাব, তুমিই বলো—যেন স্বপ্নের ঘোরে এই কথা বলিয়া শিবশঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।

দু'টি চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল, উঠিয়া বসিতে নাড়া পাইবামাত্র ঝর্ ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সুমিত্রা সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল, এ দৃশ্য দেখিল, তাহারও বুকের ভিতরে তুফান উঠিল—ইচ্ছা হইল অঞ্চল দিয়া স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া দেয়, সান্ত্বনার কথা বলে, কিন্তু কি ভাবিয়া কিছুই না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু শিবশঙ্করের চোখে বা মনে এ পার্থিব দুঃখের স্থান ছিল না। অপার্থিব জগৎ হইতে কে দু'টি কাতর আঁখি মেলিয়া চাহিয়া সকাতরে বলিতেছে, ফেরাও, ওগো, আমার আলোককে ফেরাও! শিবশঙ্কর তাহাতেই মোহাবিষ্ট হইয়াছিলেন। হঠাৎ আচ্ছন্নের মতো বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না, যেয়ো না। যদিই যাও, আমাকে ক্ষমা করে যাও। তোমার কোন কথাই আমি রাখতে পারি নি। আমায় তুমি ক্ষমা করো। তোমার মেয়ে আগে তোমার কাছে গেছে, ছেলেও যাচ্ছে, আমি রাখতে পারি নি, তোমার গচ্ছিত ধন, তুমিই তার ভার নাও।

সুমিত্রা "যেয়ো না" শুনিযাই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু পরের কথাগুলা গলিত লৌহের মত তাহার কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া তাহাকে অসাড় অচেতন করিয়া দিল। দুই হাতে সবলে কান চাপিযা ধরিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া ফিরিযা আসিল।

এই ভয়ই সে করিয়াছিল। আসিযা দেখিল, শিবশঙ্কর মূর্চ্ছিত। ঠিক মূর্চ্ছা নয়, অজ্ঞান-অচৈতন্য যাহাকে বলে তাহাও নয়, জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি কিছু একটা! সুমিত্রা তাহা বুঝিয়াও কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, নিপুণা শুশ্রূযাকারিণীর ন্যায় ধীর হস্তে কখনও স্বামীর পাযে, কখনও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। শিবশঙ্করের যে বয়স, তাহাতে এই ধরণের কঠিন আঘাত সহ্য হইবার কথা নয়। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন বিপদপাত হইতে পারে।

আলোক শুইতে যাইবার পূর্ব্বে নিত্য নিশীথে পিতার কাছে আসিয়া একটু সময় বসিত। আজ অত্যন্ত উত্তেজনাবশে চলিয়া গেলেও শয্যাপ্রবেশের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সে কথা মনে পড়িল। পিতার আবাস-মন্দিরে আসিযাই পিতার হতচেতন ভাব লক্ষ্য করিযা সুমিত্রাকে বলিল, কতক্ষণ এরকম অবস্থায় আছেন? সুমিত্রা কি বলিল বুঝা গেল না। আলোক ডাক্তার, তখনই নাড়ী ধরিয়া দেখিল, তারপর পাশের ঘর হইতে একটা চাকরকে দিয়া তাহার বুক-নলটা আনাইয়া যতটা সম্ভব পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বসিল। সুমিত্রা তাহাকে একটি কথাও বলিল না, আপন মনে যেমন সেবা করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে একসময়ে আলোক বলিল, আমি এখানে থাকি, আপনি শুতে যান্।

সুমিত্রা একথারও উত্তর দিল না।

আলোক তাহার অনুরোধ আর একবার আবৃত্তি করিল, তাহাতেও সাড়া পাওয়া গেল না।

আলোক ইহাতে বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া বলিল, ভাল, আপনিই থাকুন, পাশের ঘরটায় আমি রইলুম, দরকার হলে ডাকবেন। আশ্চর্য্য এই নারী, এখনও একটি শব্দ উচ্চারণ করিল না, একবার তাহার মুখপানে চাহিয়াও দেখিল না। আলোক পাশের ঘরে ঢুকিয়া একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। বিমাতা বস্তুটি কি তাহা চিনিয়া লইবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত তাহার হয় নাই। এই বাড়ীতে এতদিন সে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার এই বিমাতার সহিত জগতের অন্যান্য স্ত্রীলোকের যে কোথাও কোন পার্থক্য বা বিশেষত্ব আছে তাহা একটুও মনে হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্টও যেমন সে হয় নাই, বিশেষ কোনরূপ বিদ্বেষের ভাবও তাঁহার মনে স্থায়ীত্ব লাভ করে নাই। একদিন একবারের জন্য মনটা খুবই বিমুখ হইয়াছিল সত্য, আবার ভুলিতেও বিলম্ব হয় নাই। যেদিন পিতা বলিয়াছিলেন, টাকাটা বিমাতার নিকট চাহিতে, সেদিন পিতার উপর কতখানি রাগ হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না, এই নারীটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে টাকাটার নাকি দরকারই পড়ে নাই তাই ঐ ঘটনাটিও মনে স্থায়ী আসন পাতিতে পারে নাই। আজ কিন্তু তাহার আচরণ আলোককে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। পিতার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছে করুক, আলোক আদৌ তাহার প্রত্যাশী নহে, কিন্তু পিতার সেবার অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে নারী এমন ভাব অবলম্বন করিতে পারে তাহার প্রতি এতটুকু করুণাও তাহার চিত্তে রহিল না। রুগ্ন পিতার কক্ষ মধ্যে কোন 'সিন্' করার ইচ্ছা তাহার থাকিতে পারে না, ছিলও না; কিন্তু কোন রকমে উহাকে পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা সমঝাইয়া দিতে না পারিলেও সে যেন আর এতটুকু স্বস্তি পাইতেছিল না। পিতা-পুত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যে নারী তাহার অস্তিত্বটাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিল, কোন শাস্তিই যে তাহার পক্ষে কঠোর নয়, সে বিষয়েও আলোকের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা রহিল না।

এই শাস্তির চিন্তা মাত্রেই তাহার হাসি পাইল। বিমাতার অপরাধ অমার্জ্জনীয় ও গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই, শাস্তির যোগ্যও বটে, কিন্তু আর

কয়দিন পরে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আলোক নিজেই কোথায় থাকিবে? এই ভাবিয়াই তাহার হাসি আসিল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল, বিত্তশালী ব্যক্তির বহুজনমুখরিত গৃহও নীরব নিস্তব্ধ হইল, আলোক কখনও সোফায় বসিয়া, কখনও খালি পায়ে পায়চারি করিয়া বেড়াইয়া নিশা যাপন করিল।

পার্শ্বকক্ষে শিবশঙ্করের সেই অবস্থা। আর নারী, অভুক্ত, বিনিদ্র রজনী ঠিক সেই একভাবে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া—যেন একা একশত হইয়া বসিয়া রহিল। আলোক ইহাও দেখিল। শিক্ষিতা নিপুণা শুশ্রূষাকারিণীদের সেবা শুশ্রূষা ডাক্তারকে অহরহ দেখিতে হইযাছে; কিন্তু এমন নিরলস, এমন স্পন্দনহীন, শ্রান্তিহীন নিষ্ঠা ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুতেও সচরাচর পড়ে না। তাই ভোরবেলা যখন আর একবার পিতার নাড়ী ও বক্ষ স্পন্দন পরীক্ষা করিতে আসিল, তখন এই আনমিতানন নারীকে আজই প্রথম শ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া পারিল না।

ছন্দ্ব

পিতা ঔষধ খান্ না, খাইবেন না, ইহা আলোক জানিত। এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্ব্বেদীয় কোন ঔষধই তিনি খান্ না, এ সংবাদ পিতার খানসামাই তাহাকে দিয়াছিল। আলোকও পূর্ব্বে দুই একবার সামান্য অনুরোধ করিয়াছিল, শিবশঙ্কর হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছিলেন। আশী বৎসরের পুরাতন জীর্ণ পৃথিবীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কণামাত্র ইচ্ছা যে তাঁহার নাই একথা তিনি সর্ব্বদাই সকলকে শুনাইতেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীর কেন যে এত মায়া মমতা তাঁহারই উপর, কিছুতেই তাঁহাকে সে ছাড়িতে চাহে না, ইহার জন্য ধরিত্রীর সুবিচার ও সুবিবেচনায় সন্দেহ প্রকাশেও তিনি বিরত ছিলেন না।

আজ সকালে আলোক আবার সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল। সামান্য একটু ঔষধ খাইলে অথবা ইন্‌জেকসান লইলে যদি কষ্টটার লাঘব হয়, তাহা করা সঙ্গত কি না—ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, পিতার আরাম কেদারার সম্মুখে সমরেশ হেঁটমুখে দণ্ডায়মান। পিতা অত্যন্ত নির্জ্জীব ও নিস্তেজভাবে আরাম

কেদারায় শুইয়া আছেন—ইঁদানীং শুইয়াই থাকেন, পা হইতে গলা পর্য্যন্ত মখমলের একখানি সূক্ষ্ম চাদরে আবৃত। আরাম কেদারার পিঠে বালিশ উঁচু করিয়া তাহাতেই মাথা দিয়া শুইয়া থাকেন—এখন মাথাটি একটু তুলিয়া সমরেশের দিকে চাহিয়া আছেন। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি মৃদু, কাছে না গেলে কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আলোক কাছে আসিতে শুনিল, পিতা বলিতেছেন, তোমার মাকে বলগে যাও, তিনি যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে।

সমর বলিল, মাকে বলেছি, মা মত দিয়েছেন।

শিবশঙ্কর অবসন্নের মত বালিশে ঠেসান দিয়া বলিলেন, মত দিয়েছেন, ভালই। যেতে পার। আমার কোনও আপত্তি নেই—বলিয়া তিনি আলোকের পানে চাহিলেন।

আলোক সমরেশের পানে চাহিয়া বলিল, কোথায় যাবে সমর ?

সমর উত্তর দিবার আগেই শিবশঙ্কর বলিলেন, ও যুদ্ধে যাচ্ছে।

যুদ্ধে !

তাই ত শুনছি।

আলোক সরিয়া আসিয়া সমরেশের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, কি ব্যাপার বল ত হে ?

সমরেশ নতমুখে বলিল, আমি আর-এ-এফ্‌এ নাম লিখিয়ে দিয়েছি।

আলোক বলিল, নাম লিখিয়ে দিয়েছ, এই ? ভয় নেই, তোমায় তারা নেবে না, আঠারো বছরের কম হলে নেয় না।

সমরেশ বলিল, আমার আঠারো হয়ে গেছে।

তুমি ত মোটে গত বছর ম্যাট্রিক পাশ করলে—

শিবশঙ্কর মৃদুস্বরে কহিলেন, আঠারো হয়েছে। পড়াশুনো দেরীতে আরম্ভ হয়েছিল, নইলে দু'বছর আগে ওর পাশ করার কথা।

আলোক বলিল, তা হোক, তোমায় দেখলে তারা বাতিল করে দেবে। যে রোগা তুমি।

সমরেশ বলিল, মেডিক্যাল টেষ্টে আমি পাস করেছি।

এবার আর আলোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, বলিল, এতকাণ্ড হলো কবে শুনি ?

কাল। আমাদের কলেজ থেকে দশজন ছেলেকে সিলেক্ট করেছে।

আলোক নিকটস্থ চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, এ সব করবার আগে আমাদের একবার বললেই পারতে। অন্ততঃ, তোমার মাকে বলা উচিত ছিল।

সমর বলিল, মা জানেন।

পরে বলেছ ত?

না।

তবে?

মাকে বলে তবে আমি সই করেছি।

আলোক যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না; বলিল, তিনি মত দিয়েছেন তোমাকে যুদ্ধে যেতে?

সমরেশ বলিল, হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমি দেখছি তাঁকে জিজ্ঞেস্ করে, কোথায় তিনি?—বলিতে বলিতে আলোক দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। সমরেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল, শিবশঙ্কর ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি যেতে পারো, আমার আপত্তি নেই, তা ত তোমায় বলেছি।

বাড়ীর ঠিক পিছনে ছোট একখানি শব্জীবাগান, তাহার পাশ দিয়া একটি শীর্ণা নদী বহিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীটার জলও বাড়ে, বক্ষও প্রশস্ত হয়, কিন্তু, এখন জল নাই বলিলেও চলে। এক পাশ দিয়া একটি সূক্ষ্ম ধারা মুমূর্ষুর প্রাণবায়ুর মত ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। পায়ের পাতাও ডোবে না, এতটুকুই জল! ডোম ডোকলাদের দু'টা উলঙ্গ বালক-বালিকা একখানা নেকড়া দিয়া সেই জলেই মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। দৈবাৎ চুনোচানা দু'একটা মাছ বোধ হয় পাওয়া যায়, তাহারাও পাইয়াছিল, নতুবা মাঝে মাঝে ততটা হর্ষ উল্লাস প্রকাশ পাইত না। অন্তঃপুরের একটা জানালার পটিতে বসিয়া সুমিত্রা ইহাই দেখিতেছিল। শিবশঙ্করের জন্য রেশমের একটা গলাবন্ধ বুনিতে বুনিতে জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল, বোনা, রেশম, সুতা, সূঁচ সমস্তই কোলের উপর পড়িয়া আছে। সুমিত্রা জানালার একটা গরাদে ধরিয়া একদৃষ্টে সেই মাছ ধরার খেলা দেখিতেছিল।

আলোক ঘরে ঢুকিল। পদশব্দ কাহার তাহা সুমিত্রার অজ্ঞাত রহিল না;

কিন্তু যেন কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই এই ভাবেই বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অন্তর জানে আর অন্তর্যামী জানেন, দুইটি কাণ ও সারা বুকখানা পিপাসায় ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া যাইতেছিল।

আলোক এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, আপনি নাকি সমরকে আর-এ-এফ্এ যোগ দিতে মত দিয়েছেন?

সুমিত্রা জানালা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অসতর্ক ছিল বলিয়াই বোধ করি সেলাই দ্রব্যগুলি মাটিতে পড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। সুমিত্রা নত হইয়া সেগুলা কুড়াইতে লাগিল।

আলোক আবার প্রশ্ন করিল, আপনি সমরেশকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিয়েছেন শুনলাম?

এবার সুমিত্রা কথা কহিল। অত্যন্ত ধীর, সংযত ও শান্তকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

আলোক বলিল, যুদ্ধটা যে ছেলেখেলা নয়, সেটা বোধ করি আপনাদের জানা নেই।

সুমিত্রা এ কথার জবাব দিল না, আবার সেই জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

আলোক বলিতে লাগিল, যুদ্ধ থেকে খুব কম লোকেই ফিরে আসে, তা জানেন না বোধহয়। বিশেষতঃ এই আর-এ-এফ্এর লোক হাজারে একটা ফেরে কি-না সন্দেহ।

সুমিত্রা এদিকে ফিরিল। আলোকের পানে না চাহিয়াই বলিল, রোজই কাগজে পড়ি।

জেনে শুনেও আপনি অনুমতি দিয়েছেন? আলোক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। আবার বলিল, না, না, এ হতেই পারে না, তাকে নিরস্ত করুন, এ অসম্ভব।

সুমিত্রা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, আলোক দেখিল, তাহার দুইটি আয়ত নেত্রে জল টল টল করিতেছে, আর যেন ধরে না, এখনি উপচাইয়া পড়িবে। জলের বড় বড় ফোঁটাগুলা যাহাতে ইহার সামনে না ঝরিয়া পড়ে, সুমিত্রা প্রাণ-পণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিল; তারপর অন্যদিকে চাহিয়া—কতকটা উদাসভাবেই ধীর কণ্ঠে কহিল, অসম্ভব কেন? সমর কি বাঙালী নয়? ওর প্রাণে

কি জাতির কলঙ্ক আঘাত করে না? ও কি এতই হীন যে জাতির বীরত্বের গর্ব্ব, শৌর্য্যের যশঃ, এ সকল উচ্চ আশা ওর প্রাণে জাগে না?

আলোক বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক। কি আশ্চর্য্য এই নারী! দু'টি চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ এ কি অলৌকিক দৃঢ়তা। অনেকক্ষণ আলোকের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। সুমিত্রা পুনরায় নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলোক বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে সেই নিস্পন্দ নির্ব্বাক নিশ্চল নারীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু বাবার শরীরের কথাও ত ভাবতে হয়।

সুমিত্রা ওদিকে ফিরিয়াই ধীরস্বরে কহিল, তাঁকে বল গে, তিনি সমরকে নিরস্ত করুন। মা হয়ে ছেলেকে এতবড় গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে আমি পারবো না।

গৌরব?

সুমিত্রা বলিল, সেরাত্রে তোমার কথা শুনেই ওর যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে হয়েছে, তা জানো? আমায় বলে, মা দাদা বাঙালী, আমি কি বাঙালী নই? এর পরে কোন্ মুখে আমি তাকে মানা করতে পারি?

কিন্তু আমি ভাবছি বাবার কথা!—বলিতে বলিতে সেই অতিবৃদ্ধ, জরায় পঙ্গু, জীর্ণশীর্ণ পরলোক-যাত্রী পিতার উদাস-করুণ দৃষ্টি তাহাকে যেন গ্রাস করিতে চাহিল। ছুটিয়া আসিয়া বিমাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল, না না, এ হতে পারে না। বাবা তাহলে একটি দিনও বাঁচবেন না। মা, আপনার পায়ে পড়ি, ওকে আপনি নিরস্ত করুন।

সুমিত্রার বুকের ভিতরটা যেন ধক্ করিয়া উঠিল। অমাবস্যার অন্ধ আকাশের বুকে কে যেন লাল-নীল ফুলকাটা রকেট ছুঁড়িয়া মারিল। মা! এতদিন পরে সে কি সত্যই মা বলিয়া ডাকিল, কিন্তু এ যে বিশ্বাস হয় না। সুমিত্রা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আলোক যেন ভাবের প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে-ছিল, ক্ষুদ্র তৃণ অবলম্বনও তাহার ছিল না। ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, মাটিতে বসিয়া পড়িয়া,সত্য সত্যই দু'হাতে সুমিত্রার দু'টি পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মা, আপনার পায়ে পড়ি মা, আমার কথা রাখুন, বাবাকে আপনি মারবেন না।

যে জল এতক্ষণ চোখেই নিবদ্ধ ছিল, তাহাই এখন প্লাবনের রূপ ধরিয়া

বাহির হইতে লাগিল—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেছে, চোখে দেখিতে পায় না, নত হইয়া দু'হাত বাড়াইয়া আলোককে ধরিয়া তুলিয়া সুমিত্রা তাহার মাথায় বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একা সমরেশকে বুকে ধরিয়া এই স্থির-যৌবনা নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ফুলের কুঁড়ির মধ্যে মধু, পাপড়ির গায়ে লুকানো রেণুর পরমাণুর মত অনন্ত আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তস্থলে লুকাইয়াছিল। আজ সপত্নীপুত্রের মাতৃ-সম্বোধনে এক মুহূর্তে মাতৃত্বের সেই তৃষা যেন বর্ষাবারিধারায় চাতকের করুণ কর্কশ কণ্ঠের মত শান্ত, তৃপ্ত কোমল হইয়া গেল। আলোকের হাতে মাথায় মুখে টপ টপ করিয়া বৃষ্টির ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আলোক ভরসা পাইয়া বলিল, বলুন মা, আমার কথা রাখবেন? সমরকে নিরস্ত করবেন?

সুমিত্রা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। মুখে মাতার স্নেহ, চোখে মাতৃহৃদয়নির্ঝরিণীর পূত বারি, আলোকের ব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আলোক আবেগভরা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, মা!

সুমিত্রা চক্ষু নত করিল, কি যেন ভাবিল, কাপড়ের খুঁট তুলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিল, তারপর ডাকিল, আলোক!

আলোক বলিল—মা।

তবুও সুমিত্রা কিছু বলিতে পারে না। মুখ তুলিতে চায়, আপনি নত হইয়া আসে, চক্ষু তুলিতে চেষ্টা করে, জলের ভারে চক্ষু নামিয়া পড়ে। কিন্তু আলোকের পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, সে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষাও করিতে পারিতেছিল না, অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি মা, আমার কথা রাখুন। বাবার মুখ চেয়ে সমরকে আটকান।

হঠাৎ সুমিত্রার মুখের পানে চাহিয়া আলোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। যে সুগঠিত সুকুমার মুখখানি এইমাত্র নয়নসলিলে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাই এমন স্তব্ধ ও অনিমেষ কিরূপে হইতে পারে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। আলোকের মনে হইল বুঝি তাহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আলোক ডাকিল, মা।

সাড়া না পাইয়া, সুমিত্রার একটা হাত ধরিতেই বুঝিল, দেহ সংজ্ঞাহীন।

অতি সন্তর্পণে অশক্ত অবশ দেহখানিকে দুইহাতে বেষ্টন করিয়া পাশের ঘরে শয্যায় শোওয়াইয়া দিয়া, আলোক চাকর ডাকিয়া বাগানের ঘর হইতে ঔষধের বাক্স আনিতে পাঠাইল।

সুমিত্রা চক্ষু মেলিয়া চাহিতে আলোক ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, মা, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার, আমি ডাক্তার—আমায় বলুন মা।

সুমিত্রা বলিল, কষ্ট, কিছু না।

সমরকে ডাকবো ?

না।

বাবাকে খবর দেবো ?

না। শুধু তুমি ! শুধু তুমি মা বলে ডাকো।

যে দৃপ্ত আভরণ দীপ্তিশালিনীকে দূরে রাখিয়া দিত, কোথায় গেল সেই যৌবন ? আলোক যে সে দেহে মাতৃত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। আলোক ক্ষুদ্র শিশুর মত জড়াইয়া ধরিল, ডাকিল, মা, মা, মা !

সুমিত্রার চক্ষু মুদিয়া আসিল।

দুর্জ্ঞেয়

ধনীর ফটকের উপরকার লোহার জাল বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছিল মাধবী লতাটি; পার্শ্বের এক দরিদ্রের গৃহের ভগ্ন প্রাচীরলগ্ন অপরাজিতাটি লতাইয়া লতাইয়া মাধবীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তারপর একদিন অপরাজিতাটি শুকাইল। হয়ত অযত্নে, হয়ত বা স্বল্পায়ু বলিয়া, শুকাইয়া মরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল। দু'একটি পত্রহীন শুষ্ক লতা মাধবীর শ্যামল বক্ষে লাগিয়া রহিল। আমাদের গল্প আরম্ভ সেই সময়ে।

১

কিন্তু কিছু আগের কথা বলা দরকার।

বড়লোকের বাড়ীর অনেকগুলি বধূর মধ্যে প্রতিমা একটি বধূ, সেজ কি ন' কিম্বা রাঙ্গা, কি এই রকম। আর পাশের ভাঙ্গা বাড়ীর গরীবদের ঘরে তরলা একটি মাত্র বধূ। এই দুইটি বধূতে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, স্বল্পক্ষণ মধ্যে; বন্ধুত্ব স্থায়ী হইয়াছিল, বহুদিন। প্রতিমার স্বামী উকিল, বাপেরও পয়সা আছে, ওকালতীতেও বেশ দু'পয়সা আসিতেছে! পাড়ার লোকে বলে, জলেই জল বাধে। প্রতিমার স্বামীর নাম নরেশ; নামটা জানাইয়া রাখা ভাল, সেইজন্যই বলিলাম; নহিলে, স্বেচ্ছায় ত নয়ই, প্রতিমার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে পা ফেলেন নাই। তরলার স্বামী হৃদয়নাথ কেরানী, কোন্ অফিসে কর্ম্ম করেন, কত তনখা, তাহা আমরা জানি না, জানিবার চেষ্টাও করি নাই। এইটুকু শুধু জানি, তিনি বড় গরীব। একটি মাত্র ছেলে, বছর পাঁচেক বয়স, নাম তাপস। প্রতিমার ছেলেমেয়ে নাই, হয় নাই, এই ছেলেটিকে সে ভালবাসে। নিজের একটা থাকিলে, ইহার চেয়ে তাহাকে বেশী ভালবাসিতে পারিত কিনা সে বিষয়ে তাহার মনে একটা সন্দেহ আছে এবং আজিও সে-সন্দেহের নিরসন হয় নাই।

বৈকালে ঘড়িতে ঠিক যখন পাঁচটা বাজিত, প্রতিমা এই গরীবদের বাড়ীতে আসিয়া বসিত। তরলা ময়দা মাখিত, প্রতিমা রুটি পাকাইত, তরলা সেঁকিত,

প্রতিমা রুটি বেলিয়া দিত। কোন কোন দিন এক-আধটা তরকারীও প্রতিমা রাঁধিয়া দিয়া যাইত। তাহাদের গৃহে ভাল-মন্দটা প্রায়ই আসিত, প্রতিমা কিয়দংশ তরলাদের না দিয়া থাকিতে পারিত না। পাড়ার আর পাঁচবাড়ীর নারী, খুকীরা হইতে কর্ত্রীরা পর্য্যন্ত তরলার হিংসা করিত। হিংসা করিত তরলার ভাগ্যের নয়, তাহার সখী-সৌভাগ্যের।

তাহাদের হিংসার বিষেই হউক, অথবা তাহার পরমায়ুর অল্পতার জন্যই হউক, তরলা একদিন স্বামী পুত্র ফেলিয়া, চোখের কোণে জল লইয়া এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। হৃদয়নাথ কাঁদিল, তাপস কাঁদিল, প্রতিমাও কাঁদিল, কি জানি কেন, সে'ও বড় কান্নাই কাঁদিল। পাড়ার আর পাঁচবাড়ীর মেয়েরা শোকে সান্ত্বনা দিতেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, প্রতিমার বাড়াবাড়ি দেখিয়া, তরলার দেহের পূর্ব্বেই তাঁহাদের দেহগুলায় আগুন ধরিয়া গেল, পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন।

তরলার সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি, ভাল জামাটি, ভাল সেমিসটি পরাইয়া দিয়া, সিন্দূর-অলক্তকে চর্চ্চিত করিয়া, প্রতিমা সমারোহ করিয়া সখীকে শেষ সজ্জায় সাজাইল। এক হাতে চক্ষু মুছিল, অন্য হাতে সাজাইল, চোখের জল রোধ করিতে বারবার পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। তারপর যখন যাত্রার সময় হইল, তাপসকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের বাড়ী চলিয়া গেল।

বর্ষীয়ানরা বলিয়াছিলেন, ছেলে মুখাগ্নি করিবে, প্রতিমা বলিয়া পাঠাইল, না, ঐটুকু কচি ছেলেটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। হৃদয়বাবুই সেকাজ করবেন। তাহাই হইল।

২

বোধহয় সার্ভেণ্ট এণ্ড মেড-সার্ভেণ্ট এসোসিয়েসেন মারফৎ সংবাদটা প্রচারিত হইয়াছিল, প্রতিমা একদিন নির্জ্জন মধ্যাহ্নে হৃদয়নাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঝি অতিরঞ্জন করে নাই। তরলার ফটোগ্রাফখানির গলায় সদ্যঃফোটা ফুলের মালা, তখনও মলিন হয় নাই; সুবাস ঘুচে নাই, কোমলতা নষ্ট হয় নাই। ঝি বলিয়াছে, প্রত্যহ প্রভাতে বাবু নিজে বাজারে গিয়া

একছড়া করিয়া মালা কিনিয়া আনেন ; স্নানান্তে কৌশিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মালাটি তরলার প্রতিকৃতির কণ্ঠে দুলাইয়া দেন ; পূর্ব্বদিনের শুষ্ক মালাগাছি আফিসে যাইবার সময় পকেটে করিয়া লইয়া যান—পথে, গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। নিত্যকর্ম্ম মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। রবিবার ও ছুটির দিনেও, এবং বাহিরে কোন কাজ না থাকিলেও, শুধু মালাগাছিকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য বাবুকে বাহিরে যাইতে হয়। ঝি কাছেই ছিল, বলিল, বালিশের তলাটা একবার দেখুন না বৌমা।

সেখানে আবার কি, বলিয়া প্রতিমা হৃদয়নাথের মাথার বালিশটা তুলিয়া দেখিল, দুই তিনখানি মলিন, শতছিন্ন পত্রমাত্র। হাতের লেখা তরলার। বিবাহের পর তরলা সম্ভবতঃ কিছুদিন পিত্রালয়ে ছিল, সেই সময়কার লেখা চিঠি, কারণ প্রতিমা খুব ভালই জানে, তাহার পর পত্র লিখিবার কোন কারণ বা সুযোগ এই দম্পতীর হয় নাই। তরলা সেই যে দ্বিরাগমনে আসিয়াছিল, আর এই সেদিন মহাপ্রয়াণ করিল, ইহার মধ্যে একটি দিনও এই প্রায়ান্ধকার ধূমমলিন কক্ষখানি সে ত্যাগ করে নাই।

ঝি বলিল, বুঝলেন গা বৌমা, বিছানা আমিই ঝাড়ি-ঝুড়ি বটে, বালিশে হাত দেওয়া বারণ। ওয়াড় ময়লা হলে বাবু নিজের হাতে খুলে দেন, আমি সাবান দিয়ে দিই, আবার শুকোলে বাবু নিজের হাতে পরান। আমায় বলেই দিয়েছেন, সদু, বালিশে তুমি হাত দিও না বাছা, ওতে আমার দরকারী জিনিষ-পত্তর আছে। জিনিষ-পত্তর ত ঐ ছাইপাঁশ ক'টা লেখন। প্রতিমা ব্যথিত চক্ষু দু'টি ফিরাইয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। এই ছাইপাঁশ লেখনগুলির মূল্য এই শ্রেণীর নারী কি বুঝিবে ? ইহারা জীবন্ত মানুষের মূল্যই বড় বুঝে, তা মৃতের হাতের লেখন !

প্রতিমার বেদনার্ত্ত দৃষ্টির কোন সন্ধানই সদু রাখিল না, সোৎসাহে বলিতে লাগিল, ভাবনের কথা কত আর বলবো বৌমা, দেখে শুনে হাসবো কি কাঁদবো তাই শুধু ভাবি। প্রথম প্রথম, বুঝলে গা বৌমা খেতে বসে ভাত ডাল তরকারী মাছ সব সামিগ্রী আদ্ধেক করে তুলে রাখা হোত ; তারপর খাওয়া হয়ে গেলে ছাদে উঠে সেই ভাত ডাল তরকারী যত সামিগ্রী সব ছাদের ওপর রেখে আসতেন। ওমাস থেকে সেটা বন্ধ হয়েছে। আফিসের মুখপোড়া সায়েব

মিস্ত্রেরা বুঝি মাইনে কমিয়ে দিয়েছে, তাই খরচা কমান হয়েছে। তবু খেতে বসেই সব জিনিষ একটু একটু আলাদা করে রাখা হয়। বৌ ত কত লোকেরই মরে গা, আমাদের বাবুর মত এমন বাড়াবাড়ি বাপের কালেও কারুকে করতে দেখিনি বাছা। এ-সব আদিখ্যাতা নয় তো কি, বল ত গা বৌমা ?

আদিখ্যাতা কিনা বৌমা তাহা বলিতে পারিল না, অথবা বলিল না ;—তাহার মন বলিল, এমন আদিখ্যাতা যদি কেউ তাহার জন্য করে. তবে সে সাতজন্ম মরিতেও দুঃখ বোধ করিবে না।

ঝি কহিল, বৌমা ত মঙ্গলবারে মরেছিলেন, সেই থেকে বাবু মঙ্গলবার করেন —মাছ খান না, নুন খান না, তেল মাখেন না। ভোরবেলা উঠেই ধুপধুনো জেলে, ঐ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কি-সব বিড় বিড় করে বলেন —ছাইপাঁশ পদ্দো না কি বলে যে গো, তাই আওড়ান। তপু উঠলেই বলেন, তাপস, পেন্নাম করো। নিজে পেন্নামটা আর করেন না, এই আমার বাবার ভাগ্যি বৌমা ! তাহার বাবার ভাগ্যের সহিত প্রতিমার কোন সম্পর্ক ছিল না, এই 'রয়টার'-সহোদরা এখানে এই মুহূর্ত্তে উপস্থিত না থাকিলে প্রতিমা নিজেই গললগ্নীকৃতবাসে ঐ সৌভাগ্যবতীর চরণে প্রণাম করিত।

জীবদ্দশায় স্বামীর সোহাগ, আদর, পূজা অনেক ভাগ্যবতীই পায়, কিন্তু মরণে এত পূজা কয়জন নারীর ভাগ্যে জুটে ! জুটিয়াছিল মমতাজ বেগমের ; হৃদয়নাথের অর্থ থাকিলে হয় ত আর একটা তাজমহল গঠিত হইতে পারিত। চোখের জল গোপন করিবার জন্যই প্রতিমা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া কোনদিকে না চাহিয়া রাস্তাটুকু পার হইয়া বাড়ী ঢুকিয়া পড়িল।

তাপসের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, প্রতিমার ছোট জা তাহাকে লইয়া ময়রের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, প্রতিমাকে দেখিয়া ছোট জা বলিল, এতক্ষণ একলা ও-বাড়ীতে কি করছিলে দিদি ?

প্রতিমার অন্তরখানি তখনও শ্রাবণের ধারাসজল বৃক্ষপত্রের মত কাঁপিতেছিল, বলিল, একটা জিনিষ দেখছিলুম ছোট, তোকেও একদিন দেখিয়ে আনবো ! তাপস এসো বাবা, খাবে এসো। এই বলিয়া তাপসকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চলিয়া গেল, কথা বাড়াইবার মত শক্তি সামর্থ্য তাহার ছিল না।

৩

দূরপথে গরুরগাড়ী যেমনভাবে চলে, অলস মধ্যাহ্নে শহরের রাস্তায় বেতো ঘোড়ার ছ্যাকড়া গাড়ী যে-ভাবে চলে, কেরানী হৃদয়নাথবাবুও সেইভাবে চলিতেছেন। আফিসে যান, আসেন; উড়ে বামুন একটি রাখিয়াছেন, যা রাঁধিয়া দিয়া যায়, খান; মশারী টাঙাইয়া, হারিকেন সাজাইয়া, শিয়রে জানালার পটীতে জলের গ্লাস রাখিয়া, জলভরা বাটীর ওপর রেকাবে তাপসের জন্য একটি বা দুইটি সন্দেশ রাখিয়া যান; দিন এবং রাত্রি অবাধে চলিয়া যায়।

প্রতিমা আগেও আসিত, এখনও আসে। সকালে আসিয়া উড়ে বামুনকে রন্ধনাদি সম্পর্কে আবশ্যকীয় উপদেশ দান করিয়া তাপসকে লইয়া চলিয়া যায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আর একবার বকাঝকা করিয়া তাপসকে তাহার পিতার জিম্মায় রাখিয়া দিয়া যায়। লজ্জার আতিশয্য এই মেয়েটির কোনদিনই ছিল না, আজও নাই; আগে দরকার হইত না, হৃদয়নাথের সঙ্গে বিশেষ কথা কহিত না; এখন দরকার হয়, কথা বলে; কথা যদি বেশীক্ষণ বলিতে হয়, তাও বলে; হাসির কথা হইলে হাসে; দুঃখের কথা উঠিলে চক্ষু দু'টি ছলছল করিয়া উঠে, ম্লান মুখে চলিয়া যায়। পাড়ার দূরদৃষ্টি-সম্পন্না নারীরা জনান্তিকে বলাবলি করেন, বড় লোকের বড় কথা! প্রতিমার এক জা' কথাগুলা কোথায় কাহার কাছে শুনিয়াছিলেন, প্রতিমাকে বলিতে গেলে, বাধা দিয়া প্রতিমা বলিয়াছিল, কাজ নেই ভাই শুনে, আমার আবার গায়ের চামড়া বড্ড নরম, শুনলেই ফোস্কা পড়বে। জা' হাসিয়াছিল।

প্রতিমার ভিতরে একটু দুষ্টামী যে ছিল না, তা নয়। জায়ের সঙ্গে ঐ কথা হওয়ার পর হইতে যখনই সে এ-বাড়ীতে আসিত বা এ-বাড়ী হইতে যাইত, বেশ খানিক সোরগোল করিত। আশে-পাশের খড়িখড়িগুলাকেও সে যেন জানান্ দিয়া যাইত।

উড়ে ঠাকুর বিনা নোটিশে একদিন বৈকালে কামাই করিয়া বসিল। বাবুর ফিরিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া, উনান ধরাইয়া ঝি চায়ের জল বসাইয়া দিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় বসিয়া ভাবিতেছে, তাপসের হাত ধরিয়া প্রতিমা আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলে প্রতিমা বলিল, তার আর কি সন্ধ্! আমাদের বাড়ী ত আছে। তুমি এক কাজ কর, আমাদের ঠাকুরকে একবার

ডেকে আন, বুড়ো ঠাকুরকে নয়, তার সঙ্গে আমি বকতে পারবো না। নরসিং ঠাকুরকে আমার নাম করে ডেকে আন। নরসিং ঠাকুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে ডিসে ডিসচাপা দিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হৃদয়নাথ আসিলেন, প্রতিমা চা প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে খাবার সাজাইয়া সামনে আসিয়া বলিল, আজ আপনার ঠাকুর 'এ্যাবসেণ্ট্'!

হৃদয়নাথের মুখ শুষ্ক হইল, বলিল, তাই ত! ভারি মুস্কিল ত!

প্রতিমা একটু হাসিয়া কহিল, মুস্কিল বৈকি! তবে কথা এই, উকীল, কেরানী, মাষ্টার, ব্যারিষ্টার, উড়ে বামুন, ঠিকে ঝি একদিন-না-একদিন সকলেই কামাই করে।

তা করে, কিন্তু খবর দিয়ে—

হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হলে খবর দেওয়া তাদেরও ঘটে না হয় ত!

হৃদয়নাথ চিন্তিতমুখে বলিলেন—তা বটে!

প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, অত ভাববেন না, বরং উইদাউট নোটিশে কামাই করলে মাইনে কাটবার আইন থাকলে কাটতে পারেন। চা খেয়ে নিন্, মুস্কিল আসানের ব্যবস্থা আছে।

হৃদয়নাথ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, না, না, সে কিছুতে হবে না; আপনি যে আগুন-তাতে গিয়ে শরীর খারাপ করবেন, সে আমি কিছুতে হতে দোব না।

না, শরীর খারাপ করব না।

ঝি একটা পেতলের হাঁড়ীতে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিক না, আমি নামিয়ে নিতে পারবো'খন।

পারবেন ত? হাত পুড়িয়ে বসবেন না ত?—হাসিমুখে কথাটা বলিয়াই প্রতিমার মুখ মলিন হইয়া গেল। কয়েকমাস পূর্ব্বের কথা, তরলার তখন খুব অসুখ, প্রায় শয্যাশায়ী, ঠাকুর তখনও পাওয়া যায় নাই—চেষ্টা চলিতেছে, সেই সময়ও তরলা মরিতে মরিতে উঠিয়া ভাতের হাঁড়ীটি নামাইয়া দিয়া যাইত; এক একদিন প্রতিমাও নামাইয়া দিয়া গিয়াছে। অল্প বয়সের, সমবয়স্ক, অধিকবয়স্ক অনেক গৃহিণীকে প্রতিমা দেখিয়াছে, মিশিয়াছে, কিন্তু কর্ত্তব্যে এমন অবিমিশ্র নিষ্ঠা প্রতিমা আর দেখে নাই। তরলা ঘরখানিকে এমন করিয়া রাখিত, তুচ্ছ

গামছাখানিকেও এমন যত্নে পাট্ করিত, বিছানাটিকে এমন সুচারু করিয়া পাতিত যে, মনে হইত যেন ভক্ত-পৌত্তলিকও তাহার দেবতার জন্য তেমনটি করিয়া করিতে পারে না। সেই যে কণ্টকাকীর্ণ পথে বুক পাতিয়া দেওয়া বলে, এই লোকটির জন্য তরলা তাহাও পারিত। হৃদয়নাথ সকালে টিউশানি করিতে চলিয়া যাইতেন, রান্নাবান্না, ঘর-দোয়ারের সব কাজ করিয়া বধূটি কোন্ ফাঁকে যে তাহার জুতাটিও কালী লাগাইয়া বুরুষ করিয়া রাখিয়া দিত, আশ্চর্য! এতটা করিতে হইত না বটে, কিন্তু তরলার দৃষ্টান্তে প্রতিমা নরেশচন্দ্রের অনেকগুলি কাজ নিজের হাতেই টানিয়া লইয়াছিল। হৃদয়নাথকে জলখাবার খাইতে দিয়া তরলা জলের গ্লাসটি মাটিতে নামাইত না, ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; খাওয়া হইলে হাতে জল ঢালিয়া দিত।

যে পায় নাই, তাহার হয়ত দুঃখ হয় না, সে হয়ত এ অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে না; যে পাইয়াছে এবং পাইয়া যে হারাইয়াছে, তাহার দুঃখ অপরিসীম। জানিনা, বুঝিনা, বুঝিতে পারি না, পুরুষে সে দুঃখের পরিমাপ করিতে পারে কি-না, কিন্তু নারী কাঁদিয়া মরে! প্রতিমা চায়ের বাটিটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হৃদয়নাথের হাতে বাটি তুলিয়া দিয়া তবে যেন সে আরাম অনুভব করিল।

চা-পানান্তে চায়ের বাটিটি নামাইয়াছে মাত্র, প্রতিমা ছোট্ট একটি রেকাবিতে চারিটী পাণ আনিয়া ধরিল। একদিন ছিল, যেদিন ঠিক এমনই ভাবে ঐ রেকাবিতেই পাণ লইয়া আর একটি নারী সামনে আসিয়া দাঁড়াইত। আজকাল ঝি সন্ধ্যার ও রাত্রের পাণ সাজিয়া ডিবায় ভরিয়া রাখিযা দিযা যায়। চায়ের পরে দুইটি খাওয়া হয়, রাত্রের জন্য দুইটি রাখিয়া দেওয়া হয়।

প্রতিমা তাপসের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, আপনি ত ন'টার সময় খান্, না?

হৃদয়নাথ কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, হাঁা, ন'টা, সাড়ে ন'টা, এমন বাঁধাবাঁধি কিছু নেই।

আচ্ছা, বলিয়া প্রতিমা চলিযা গেল। হৃদয়নাথ শূন্য ঘরে প্রদীপের কাছে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

কিয়ৎপরে বড় বাড়ীর ভৃত্যের কোলে চড়িয়া তাপস ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য জানাইয়া গেল, তাপসবাবুর আহারাদি হইয়া গিয়াছে।

পিতা পুত্রকে কাছে বসাইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কি খাইয়াছে, কতখানি খাইয়াছে, স্বহস্তে খাইয়াছে অথবা কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমনই সব একান্ত অনাবশ্যক ও নিরর্থক প্রশ্ন করিয়া শেষকালে জিজ্ঞাসিলেন, হ্যাঁরে তাপস, আমাকে খেতে যেতে হ'বে কিনা তোর মাসিমা কিছু বলে দিয়েছে নাকি ?

না বাবা। ঘুম পেয়েছে বাবা।

হৃদয়নাথ তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন ; তাপস অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। কয়েকটি সন্তানকে যমের হাতে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল, দম্পতির হৃদয়ভরা স্নেহ উজাড় হইয়া এই শিশুটির উপর বর্ষিত হইয়াছিল ; একজন ত মায়াপাশ ছিন্ন করিল, অপরজন যক্ষের ধন আগলাইয়া পড়িয়া আছে !

ন'টা বাজিতে তখনও বিলম্ব আছে, দ্বারে কড়া নড়িয়া উঠিল ; হৃদয়নাথ বুঝিলেন, আহারের আহ্বান আসিয়াছে। মশারীটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। যে চাকর তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, তাহাকে তাপসের কাছে অবস্থান করিবার আদেশ প্রতিমা নিশ্চয়ই দিয়াছেন ভাবিয়া, যদিচ বিশ্বাসী চাকর, তথাপি সাবধানের বিনাশ নাই চিন্তা করিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া মণি ব্যাগটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন। কড়া তখন খুব জোরে নড়িতেছে।

দ্বার খুলিয়া হৃদয়নাথ যাহা দেখিলেন, তাহা যেমন অভাবনীয় তেমনই আশ্চর্য্য-জনক। প্রতিমা দুইহাতে সজ্জিত ও আবৃত আহার্য্য সমেত প্রকাণ্ড থালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সঙ্গের ভৃত্যের হাতে একটি জলের গ্লাস ও একখানি কার্পেটের আসন। প্রতিমার হাত দু'খানি যে 'ভারিয়া' গিয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। ক্লিষ্ট আননে হাসি আনিয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি ?

হৃদয়নাথ কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন, না, ঘুমোই নি। কিন্তু আপনি এ-সব বয়ে আনতে গেলেন কেন ? ঠাকুরকে দিয়ে পাঠালেই ত হোত। কিম্বা আমিও ত অক্লেশে যেতে পারতুম।

প্রতিমা বলিল, উনিও আসছিলেন, তারপর মনে হোল কাল শনিবার,

টালিগঞ্জের রেস, ঘোড়াদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি খুলে বসে পড়লেন। আমায় বল্লেন, তুমিই খাইয়ে এসো গে।

হৃদয়নাথের কুণ্ঠার অবসান তখনও হয় নাই ; পুনশ্চ বলিলেন, আমায় খবর পাঠালে আমিই যেতুম। না-হয় ঠাকুরকে দিয়ে খাবার পাঠালেও হোত। নিজে কেন এত কষ্ট করা ?

প্রতিমা সে কথার জবাব না দিয়া, ভৃত্যের দ্বারা আসন পাতাইয়া, জলের ছিটা দেওয়াইয়া, থালা নামাইয়া ঢাকাগুলি খুলিতে খুলিতে বলিল—বসুন।

চাকরকে বলিল, তুমি যাও হরি, একটু পরে কদমকে পাঠিয়ে দিও, সকড়ি নিয়ে যাবে।—বলিয়া মশারীর চাল হইতে পাখাখানি পাড়িয়া সামনে আসিয়া বসিল। মশারীর ভিতরে ছোট্ট একটি বালিশে মাথা রাখিয়া তাপস ঘুমাইতেছিল, পার্শ্বের বড় বালিশটার উপর কয়েকটি ফুল্লমল্লিকা! বালিশের নিম্নে কি আছে, তাহা প্রতিমা জানিত, আপনা হইতেই চক্ষুদু'টি উঠিয়া তবলার ছবিখানিতে পড়িল, তবলা যেন নবোঢ়া বধূর মত কুন্দফুলের মালা পরিয়া সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

হৃদয়নাথ আড়ষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি, আপনি বাতাস করতে বসবেন নাকি ?

প্রতিমা কেরোসিনের আলোটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, আনত মুখে হাসিয়া বলিল, দোষ কি !

না, না, দোষের কথা নয়, কিন্তু দরকার হয় না।

প্রতিমা বলিতে যাইতেছিল, আগে দরকার হোত, কিন্তু থামিয়া গেল। যে অগ্নি ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহাতে বায়ু সঞ্চালিত করিয়া লাভ কি! কহিল, আপনি ত তরকারিতে খুব ঝাল খান্, আমি ঠাকুরকে ঝাল দিয়ে সব তরকারি আলাদা আপনার জন্যে করতে বলে দিয়েছিলুম, দেখুন ত কেমন করেছে ?

হৃদয়নাথ মাংসের কালিয়াটা চাকিয়া কহিলেন, চমৎকার রেঁধেছে। ভারি সুন্দর হয়েছে।

ওটা কিন্তু ঠাকুর রাঁধেনি।

তাহার বলার ভঙ্গীতে হৃদয়নাথের মনে হইল, এটা প্রতিমাই রাঁধিয়াছে , বলিলেন, এটা আপনি রেঁধেছেন বুঝি ?

প্রতিমা কথা বলিল না, আনত হাসিমুখ আরও নত করিল মাত্র।

আপনি কি মাঝে মাঝে রাঁধেন ?

প্রতিমা অপরাধীর মত নিম্নকণ্ঠে কহিল, না।

হৃদয়নাথ ডিমের কচুরী খাইতেছিলেন, বলিলেন, এমন সুন্দর কচুরী আমি কখনও খাই নি কিন্তু।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, ভাল হয়েছে ?

হৃদয়নাথ হাসিয়া বলিলেন, শুধু ভাল হয়েছে বল্লে ঠিক বলা হবে না, তার চেয়ে ঢের বেশী ভাল। এটাও ঠাকুরের তৈরী বলে মনে হচ্ছে না।

প্রতিমা কথা কহিল না, কিন্তু নতাননা নারীর মুখখানিতে তৃপ্তির যে লালিমা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতেই হৃদয়নাথ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। সে ভাষা পাঠ করিতে সেই ভাগ্যবানই পারে, যাহাকে কেহ কোনদিন এমন করিয়া আহার করাইয়াছে ; ব্যঞ্জনের সুস্বাদে অথবা শুষ্ক হৃদয়ে স্নেহসলিলসম্পাতে আহার্য্য বস্তু এমন রুচিকর হইয়া উঠিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বলিতে পারে একমাত্র সে-ই, এমন করিয়া খাইবার সৌভাগ্য জীবনে যাহার একটি দিনও হইয়াছে !

হৃদয়নাথ কহিলেন, আজ আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

প্রতিমা নীরবে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

জলের গ্লাসটি, আসনখানি পর্য্যন্ত এনেছেন।

প্রতিমা নীরব।

নরেশবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে ?

না, এইবার হবে।

তবে আপনি আর দেরী করবেন না, যান ; ঝি এসে সকড়ি নিয়ে যাবে'খন ; আপনি যান।

প্রতিমা লজ্জারুণ মুখে কহিল, ব্যস্ত হতে হবেনা, আপনার খাওয়া হোক্ না, তার পরে যাব।

হৃদয়নাথ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আমার খাওয়া হয়ে গেছে! ওঃ এতক্ষণ ধরে আমি কখনও খাইনি বোধ হয়।

প্রতিমা হাসিয়া কহিল, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে খাওয়া হযে গেলো না-কি? কিন্তু আমার দেরী হয় নি।

না, না, কত আর খাব?—হৃদয়নাথ জল খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কলতলা হইতে আচমন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রতিমা স্বয়ং এঁটো বাসন-পত্রগুলি গুছাইয়া তুলিতেছে, সসব্যস্তে কহিলেন, ও আপনি করছেন কি?

এমন আর কি!—বলিয়া প্রতিমা সেগুলিকে বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া আসিয়া, স্থানটি পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, কদম ত এখনও এলো না, কখন্ তার ফুর্সৎ হবে তারও ঠিক নেই, ততক্ষণ আপনাকে কেন আট্‌কে রাখি? ঐ যে, পাণের ডিবে ওখানে রেখেছি।

রূপার ডিবা, উপরে নাম লেখা নবেশ-প্রতিমা!

হৃদয়নাথ পান খাইতে লাগিলেন; প্রতিমা বলিল,—এইবার আমি যাই, আপনি দোর বন্ধ করবেন চলুন।

চলুন, আপনাকে এগিযে দিয়ে আসি।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, তার দরকার নেই, তিনচারখানা বাড়ীর মেয়ে ও পুরুষ যাঁরা আমার আসা-পথ চেয়ে ছিলেন, যাওয়া-পথ থেকেও যে চোখ তুলে নেন্ নি, তা আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি।

কথাগুলা যে শুনিল, তাহার মুখখানা নিমিষে অন্ধকার হইয়া উঠিল, কিন্তু যে বলিল, তাহার পাতলা ঠোঁট দু'খানিতে হাসি, শরতের রৌদ্রের মত ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল।

৪

ইহারই ঠিক পূর্ব্বের দিন পুনর্ব্বার বিবাহের কথা পাড়িয়া আফিসের আশু-বাবু একপ্রকার ধমকই খাইয়াছিলেন। দিন দুই পরে আফিসের টিফিন কামরায় বসিয়া নিভৃতে আশুবাবু যখন তাঁহার ভগ্নীটির রূপ ও গুণগ্রামের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করিলেন, শ্রোতাটির সে উষ্ণতা ত ছিলই না, অধিকন্তু একটু আগ্রহও যেন প্রকাশ পাইল।

আশুবাবুর ভগ্না সুলতার বয়স ষোল পার হইয়াছে কি হয়-নাই বটে, কিন্তু কাজেকর্ম্মে, সাংসারিক দক্ষতায় তাহার তুলনা মেলা ভার। আশুবাবু কিছুই খরচ করিতে পারিবেন না তাই, নতুবা সুলতার মত মেয়ে কোনও বনেদী রাজা-রাজড়ার ঘরে পড়িলেই যেন ঠিক মানাইত।

হৃদয়নাথবাবু শুনিয়াই গেলেন, প্রতিবাদও করিলেন না, কোন প্রশ্নও করিলেন না। আশুবাবু সেদিনের মত নিরস্ত হইলেন। চারে মাছ আসিয়াছে জানিতে পারিলে 'ছিপাড়ী' চুপ করিয়া যায়।

হৃদয়নাথের বয়স চল্লিশ, একচল্লিশ, অথবা বিয়াল্লিশ; পঁয়তাল্লিশ যে নয়, ইহা ঠিক। একদিন আশুবাবু বলিলেন, হুঁ, চল্লিশ আবার বয়েস! আজকাল লোকে ত বিয়েই করে থাকে চল্লিশ-বিয়াল্লিশে। আগে চল্লিশ বছরটা দোষের ছিল, কারণ চালশে ধরতো, চশমা নিতে হোত! আর এখন, হুঁ, চশমার কথা আর বলবেন না মশাই, দশ বছরের ছেলের চোখেও চশমা! এই ত আমাদের আফিসে ক'টি ছোকরা এপ্রেন্টিস্ এসেছিল, বয়স কুড়ি একুশের বেশী হবে না, টাট্‌কা গ্র্যাজুয়েট সব, দেখেছিলেন ত, চোখে সব হরেক রকম চশমা! সোনার, নিকেলের, কচ্ছপের খোলার, আলুর খোসার—কত রকমের! হুঁ!

সেদিনও কাটিল।

তাপসকুমার কি ভাবিবে? নূতন মা'কে কি সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিবে? তা যদি না পারে?

আশুবাবু এ সমস্যারও সুন্দর সমাধান করিলেন, কহিলেন, হা-ঘরে ঘরের মেয়ে আনলে ছেলেমেয়ের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সুলতা ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ; আমার তিন তিনটে ছেলে আর চার চারটে মেয়েকে সেই ত মানুষ করেছে মশাই, তার বৌদি ত খালাস হয়েই খালাস। তার ওপর, সুলতা

আপনার তাপসকুমারকে জানে। যেদিন থেকে তাপস মাতৃহীন হয়েছে, সেদিন থেকে প্রায়ই সে তাপসের খোঁজ নেয়! আমার মুখে শুনেছে কিনা সব।

আশুবাবুর সহকর্মীরা প্রায়ই জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কতদূর এগুলো আশুবাবু?

আশুবাবু বলেন, চার খাচ্ছে, ফুট দিচ্ছে, চানাচ্ছেও বটে, সুতোতেও গা লাগছে, এই গপ্ করে টোপ ধরলে বলে।

আশুবাবুর ভবিষ্যৎবাণী ফলিতে বিলম্ব হইল না। একদিন সকালে তাপস প্রতিমাকে গিয়া বলিল, মাসিমা, বাবা দু'দিন বাড়ী আসবেন না। আমি আপনার কাছে থাক্‌বো।

প্রতিমা তাহাকে জানুতে জড়াইয়া ধরিয়া, নত হইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল, বেশ ত বাবা—থাকবেই ত! কিন্তু তোমার বাবা কোথায় যাচ্ছেন তপু? তোমার নতুন মা আনতে নয় ত?

তাপস সাশ্চার্য্যে কহিল—নতুন মা কোথায় মাসিমা?

তা ত' জানি নে বাবা! হয়ত আছেন কোথাও। তোমার বাবা ত এখনও আফিস্ যান্ নি, জিজ্ঞেস করে এসো ত বাবা, তিনি কোথায় যাচ্ছেন?

তাপস ছুটিয়া গেল, ছুটিয়া ফিরিল, বলিল, বাবা বাগনানে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁর আফিসের এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন!

প্রতিমা হাসিয়া বলিল,—সোনা ফেলে আঁচলে গেরো। তোমাকে বাদ দিয়ে নেমন্তন্ন!

নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা প্রতিমার ভাল লাগিল না; কিন্তু সে সম্বন্ধে আলোচনাও সে করিল না; আর করিবেই বা কাহার সঙ্গে?—কেনই বা করিবে? মা-হারা এই ছেলেটিকে দু'রাত্রি বুকে চাপিয়া খুব ঘুমাইল।

৫

তাপস ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিল, মাসিমা, আমার ঠাক্‌মা এসেছে।

প্রতিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার ঠাক্‌মা আছেন তা ত জানতুম না তপু!

তুমি দেখবে এস না, মাসিমা! সাদা ধবধব করছে চুল, একটিও দাঁত নেই, চোখে চশমা, এই-এ্যাতো মোটা। এস না মাসিমা।

চল যাই, বলিয়া প্রতিমা তাপসের হাত ধরিয়া এ-বাড়ীতে আসিল। নবাগতা রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া ঠাকুরের নিকট রান্নাবাড়ার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া লইতেছিলেন, প্রতিমা আসিয়া রোয়াকের নীচে দাঁড়াইয়া দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল; ইহার বেশী পারিল না। তাপস এইভাবে পরিচয় করাইয়া দিল, ঠাকুমা চশমার ভেতর থেকে কুৎকুৎ করে দেখছে, কিন্তু চিনতে পারছে না! আমার মাসিমাগো, আমার মাসিমা।

ঠাকুমা বলিলেন, বস বাছা বস। তোমাদেরই বুঝি এই বড় বাড়ীটা!

প্রতিমা উত্তর দিল না, অনাবশ্যক বলিয়া; তাপসের নিকট এই প্রসঙ্গ খুবই স্বাদু। সে পরম উৎসাহে বলিতে লাগিল, দু'টো মস্ত মস্ত ময়ূর আছে বুঝলে ঠাকুমা? প্যাখম ধরলে কি সুন্দর দেখায়, না মাসিমা?

হ্যাঁ বাবা।

এখন আর প্যাখম ধরে না কেন মাসিমা?

ওরা শুধু বর্ষাকালে মেঘ দেখলে প্যাখম তুলে নাচে।

আর সেই তোমার হীরেমোনটা ময়ূর দেখলেই চেঁচায়, না মাসিমা?

হ্যাঁ বাবা।

তোমার কাকাতুয়াটা ভাল নয় মাসিমা, আমায় দেখলেই দূর্ দূর্ করে চেঁচায়।

প্রতিমা তাপসকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, ও কথা কি বলতে আছে? কাকাতুয়াটা সব্বাইকেই দূর্ দূর্ বলে। তোমার বড় মাসিমা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, দেখলেই দূর্ দূর্ করেন, ও তাই শিখে নিয়েছে।

আচ্ছা মাসীমা, মেশোমশাই বিলেত থেকে যে কুকুরটা এনেছেন, সেটার বাচ্ছা হলে আমায় একটা দিতে বলো না!

তুমি বলো-না বাবা!

আমি বল্‌তে পারবো না, তুমি বলো।

ঠাকুমা প্রশ্ন করিলেন, ছেলেটা বুঝি তোমার খুব নেওটো?

প্রতিমা এ কথারও উত্তর দিল না, আর একটু জোরে তাপসকে কোলে চাপিল।

হৃদয়নাথ ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিলেন না। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই; প্রতিমা আসিলে, শত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও বাহিরে আসিতেন; কোনও কথা না থাকিলেও দু'টা কথা কহিতেন—একদিন দুইদিন একমাস দুইমাস একবছর দুইবছর নয়, যেদিন তরলার সঙ্গে প্রতিমার ভাব হইয়াছিল, সেইদিন হইতে ইহাই ঘটিত; তরলার মৃত্যুর পরেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই সাধারণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের অভাব আজই ঘটিল এবং ইহা স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক হইতে পারে না, ভাবিতে ভাবিতে প্রতিমা উঠিল, 'আপনি বসুন' বলিয়া আবার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বিদায় লইল। তাপস সঙ্গে আসিয়াছিল, সঙ্গেই গেল।

তাপসের যাওয়া-আসা কমিয়া আসিল, প্রতিমা ইহাও লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু কারণ অনুসন্ধানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। নরেশ বলিতেন, ডেকে পাঠালেই ত পারো। সে হয়ত নতুন ঠাক্‌মা পেয়ে সকল সময় আসে না, তুমি ডাকলেই আসবে।

প্রতিমা ডাকিল না। একটা ছেলেকে সর্ব্বদা বুকে পিঠে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু ভগবান যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার কোন্ চেষ্টা কবে সফল হয়?

কয়েকদিন পরে মধ্যাহ্নে শাঁখ বাজিয়া উঠিতেই পাড়ার লোকে আসল ব্যাপার চাক্ষুষ করিল। হৃদয়নাথ বিবাহ করিয়া বধূ লইয়া গৃহে আসিলেন।

প্রতিমা সেলাই করিতেছিল, তাহার ছোট জা আসিয়া বলিল, ওমা দিদি, তুমি বুঝি কিছুই দেখ নি, তরলার বর যে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলো গো।

কথাটা যে সত্য, মনে মনে তাহা উপলব্ধি করিয়াও যেন সত্য নয়, যেন বিশ্বাস হয় না, এইভাবে প্রতিমা জিজ্ঞাসু-নেত্রে ছোট জার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অশিক্ষিতা বর্ণপরিচয়-জ্ঞানহীনা সদু ঝির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল; সদু বলিয়াছিল, ভাবন দেখে আর বাঁচিনে মা। তবু কি বিশ্বাস হয়—না, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়? আহার্য্যের অর্দ্ধাংশ উৎসর্গ করার কথা, শিয়রের বালিশের নিচে সযত্নে রক্ষিত সেই লেখন ক'টির কথা, নিত্য প্রভাতে প্রতিকৃতি-কণ্ঠে পুষ্পমাল্যদানের কথা!—মাগো, কেমন করিয়া সব মিথ্যা হইয়া গেল!

প্রতিমার চোখের নিচে জল টলটল করিতে লাগিল। পদ্মার পাড়ের হর্ম্ম্য যেন চক্ষুর পলকে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

ছোট জা অতশত বুঝিল না, কহিল—চল না ভাই দিদি, বৌ দেখিগে।

প্রতিমা সেলাইটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল—দূর্, বুড়ো মিন্সের বৌ দেখতে যেতে লজ্জা করে না ?

দিদির এক কথা ! যে বিয়ে করে আনলে তার লজ্জা করলো না, যে দেখবে তার হবে লজ্জা ! আমি জানালা দিয়ে দেখেছি দিদি, মন্দ নয়, বেশ বৌটি হয়েছে।

এরই মধ্যে দেখেছিস্ ? তবু আবার যেতে চাচ্ছিস্ যে !

কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না ?

আমার হয় না। হ্যাঁরে ছোট, বৌয়ের বয়স কত ?

কত আবার ! ষোল সতেরো।

বলিস্ কি রে ! মিন্সে পাগল না-কি ? চল্লিশ পঁযতাল্লিশ বছরের বুড়ো, একটা ষোল বছরের কচি মেয়ের সর্ব্বনাশ করলে ? এটা আমাদের বাঙলা দেশ কিনা, বাঙলা দেশে সবই সম্ভব, মেয়ের বাপ-মাও দেখেশুনে সর্ব্বনাশ ঘটতে দেয় ! আশ্চর্য্য !

সর্ব্বনাশ কেন করবে দিদি ! বিয়ে করেছে। আর বুড়ো কনে পাবেই বা কোথায় বল ?

প্রতিমা বলিল, বিধবা বিয়ে করলেই পারতো। বয়স্কা বিধবার ত অভাব ছিল না দেশে।

ঘন ঘন শাঁখ বাজিতেছিল ; ছোট বলিল, তুমি যাবে না ত ! আমি যাই, ভাই, জানালা দিয়ে দেখিগে।

প্রতিমা কিছুই বলিল না।

একটু পরে তাপস আসিয়া বলিল, মাসিমা, আমার নতুন মা এসেছে। এসেই আমায় কোলে নিয়েছে। নতুন মা খুব ফর্সা মাসিমা। বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন মাসিমা !

পাছে চক্ষু দু'টি ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে, প্রতিমা তাপসের পানে চাহিতেও পারিল না, নতচক্ষু মাটিতে নিবদ্ধ রাখিয়া রূদ্ধকণ্ঠে কহিল,—আমায় ! না বাবা, তুমি ভুল শুনেছো।

আমার ভুল ? কখ্‌খনো নয়। বাবা বল্লেন, মাসিমাকে বলে এসো তাপস। আমি যাই মাসিমা।

তরলার কথা মনে পড়িয়া গেল কিনা জানি না, প্রতিমার টানা টানা ডাগর চোখ দু'টি জলে ভরিয়া আসিল, দুই হাতে একটিবার মাত্র তাপসকে বুকে চাপিয়া, মুখে চুমা দিয়া ছাড়িয়া দিল ; তাপস চলিয়া গেল।

নরেশ বলিলেন, হৃদয়নাথবাবু আবার বিয়ে করে মরতে গেলেন কেন এ বয়সে।

প্রতিমা খড়ের আগুনের মত হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি হলেও তাই করতে গো ; করবেও হয় তো ! নরেশ হাসিয়া বলিলেন, সে তখন দেখা যাবে !

৬

সুলতা বলিল, তপুর যে আজ জন্মদিন তা ত তুমি আমাকে বল নি ?

হৃদয়নাথ ম্লানমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, আমারও মনে ছিল না।

রোয়াকে কাপড়, জামা, জুতো ও নানাবিধ আহার্য্য রক্ষিত, ও-বাড়ীর ঝি কদম রোয়াকের নিচে বসিয়া বলিল, ঐ থালাটালাগুলো খালি করে দাও বৌমা !

তাপস নূতন কাপড়, নূতন জামা, জুতা পরিয়া মাসিমাকে প্রণাম করিয়া আসিল।

সাজ সজ্জা সমস্ত তাহারই দেওয়া। তাহার পছন্দের তারিফ সে নিজেও না করিয়া পারিল না ; মনে মনে বারবার বলিল, তপুকে কি সুন্দরই না মানাই-য়াছে ! তাপস মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু সে যে শান্ত ও স্থির নহে, বরং অতি মাত্রায় চঞ্চল, যেন ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে, প্রতিমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাও ধরা না পড়িয়া পারিল না। হঠাৎ একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, তপু, কাপড় জামা তোমায় কে পরিয়ে দিলে ? তপু সানন্দে কহিল, কেন, আমার নতুন মা। প্রতিমা বলিতে গেল, আমার কাছে কেন এলে না বাবা, আমি আরও ভাল করে সাজিয়ে দিতুম—তাহার কথা শেষ হইবার আগেই তাপস বলিল, কেন মাসিমা, নতুন মা ত বেশ পারেন। জান মাসিমা, নতুন মার পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হলে কি হয়—তিনি মেম মিশনরীদের স্কুলে

পড়েছিলেন কিনা, তাঁর হাতের সৌখীন কাজ খুব ভাল। আমার সে যা কিছু জানত না। প্রতিমা এতক্ষণ বাঁ হাতে তাপসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই কথাগুলা শুনিতে শুনিতে, হাতখানা নিঃশব্দে 'ঝরিয়া' পড়িয়া গেল। প্রতিমা কি যেন বলিতে চাহিল, গলার নিচে কি একটা কথা মোচড় দিয়া ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল, সজোরে চাপা দিয়া পার্শ্বের আলমারীটা খুলিল; তারপর মস্তক চুম্বন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া দুইটি টাকা তাহার হাতে দিয়া, "এসো বাবা, বেঁচে থাক" বলিয়া দরজা পার করিয়া দিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া, সুলতা মধ্যাহ্নে বড় বাড়ীতে গিয়া প্রতিমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভাল করিয়া কথা হইল না, গল্পও জমিল না, সুলতার মনে হইল, ধনী-গৃহের বধূটির রূপের, ধনের গর্ব্বের সীমা নাই। দু'একটি একথা সে-কথার পর সুলতা আসল কথাটি বলিয়া ফেলিল, উনি বলছিলেন, তপুর জন্মদিনে আজ যদি আপনি আমাদের বাড়ীতে খান্—

প্রতিমা ধীর সংযত, সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—আমি ত কোথাযও খাইনে।

সুলতা ইহার পরে, আর কি বলিয়া অনুরোধ করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া বলিল—তবু একবার আসবেন দিদি, আপনারই দেওয়া পাঁচ সামগ্রী দিয়ে তপু খাবে—

প্রতিমা কথাটা সেইখানেই শেষ করিয়া দিয়া কহিল—জন্ম জন্ম খাক্।

সুলতা বলিল, আপনি ত আমাদের বাড়ীতে যেতেন দিদি, কতদিন ওঁকে খাইয়েছেনও—

প্রতিমা বলিল, আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না। আপনি আমাকে মাপ করবেন।

*　　　*　　　*

স্বামী-স্ত্রীতে রাত্রে এইরূপ কথা হইল:

মাগীর সঙ্গে তোমার ভালবাসা হয়েছিল না কি গো?

ছিঃ!

শুধা—

ছিঃ নয় গো, ছিঃ নয়, বলই না খুলে, শুনে সার্থক হই। এত আনাগোনা, এত খাওয়ান-দাওয়ান, এত আদর-যত্ন, আর এখন একবার আসবারও সুবিধে হয় না!

হৃদয়নাথ কি ভাবিতেছিলেন, ভাবিতে ভাবিতেই অসংলগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন—ছিঃ!

সমাপ্ত